আমার বন্ধু নজরুল

আমার বন্ধু নজরুল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক :

হরফ প্রকাশনী

এ-১২৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলকাতা-১২

পথম প্রকাশ : ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯৬৫, জুন ॥ প্রকাশক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৩৭-১ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা-৩৭ ॥ প্রচ্ছদপট : মানিক সরকার ॥ মুদ্রক : রাজেন্দ্র নাথ দলপতি, শ্রীনারদা প্রেস, ৪-এ বৃন্দাবন বোস লেন, কলকাতা-৬ ॥ একমাত্র পরিবেশক : হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২ ॥

দাম : আট টাকা

AMAR BANDHU NAZRUL

by :

Sailajananda Mukhopadhyaya

● কবি নজরুল : ৬৬তম জন্মদিনে ●

পল্টন হ'তে সদ্য প্রত্যাগত

হাবিলদার বেশে নজরুল ইসলাম

এক

নিজের সৃষ্টি দিয়ে যিনি জনচিত্ত জয় করেন, জনগণ শুধু তাঁর সৃষ্টিটুকু পেয়েই নিশ্চিন্ত থাকতে চায় না। সৃষ্টির পশ্চাতে আত্ম-গোপনকারী স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত জনমানসের কৌতূহল যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না। তাই কবি-সাহিত্যি-কের রচনার সঙ্গে তাঁদের জীবনচরিত রচনা করবার জন্য একজন লেখকের প্রয়োজন হয়।

এ যেন একটি বড় নদীর উৎসমুখ দেখবার ঔৎসুক্য। যে নদীর প্রবল প্রাণ-বন্যায় দেশের চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত হয়ে গেল, কবি তার যে অনুপম সুর মাধুর্য্যে ভাবের ভুবন ভরিয়ে দিলে—কোথায় কোন্ অনুর্বর প্রান্তরের পারে, অখ্যাত অবজ্ঞাত কোন্ গ্রামপ্রান্তের পর্ণকুটীরের কাছে তার উৎসমুখ—তাই দেখবার আগ্রহ যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তখন বুঝি সেই মানুষটির ডাক পড়ে—যে ছিল তার সেই একক যাত্রারম্ভের একান্ত সহচর।

সেখানে আমার প্রয়োজন হয়ত-বা কিছুটা আছে। কারণ আমিই ছিলাম কাজী নজরুল ইসলামের বাল্যবন্ধু। একই দেশে বাড়ী। একই সঙ্গে পড়েছি। একই দিনে কলকাতায় এসেছি। মাঝখানে মাত্র কিছুদিনের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙ্গালী পল্‌টনে নাম লিখিয়েছিলাম দুজনে একসঙ্গে। আমার এক বিত্তবান পরমাত্মীয়ের চক্রান্তে আমি 'আন্‌ফিট্' হলাম, নজরুল চলে গেল প্রথমে নৌসেরায়, তারপর করাচীতে। সেখান থেকে লেখা তার অনেকগুলি চিঠিপত্র ছিল আমার কাছে। তখন তো বুঝিনি নজরুল এত বড় হবে, তাই সে-সব চিঠি আমি যত্ন করে রাখিনি, হারিয়ে ফেলেছি।

আমরা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম ইস্কুলে পড়বার সময়ে। নজরুল লিখত গল্প, আমি লিখতাম কবিতা। একদিন সে হঠাৎ একটি কবিতা লিখে বসলো। আমি তার কবিতা পড়ে তো অবাক্! বললাম, তুমি আর গল্প লিখো না। তাই-না শুনে নজরুল কবিতা লিখতে লাগলো। তার চুরুলিয়া গ্রামের বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড একটা মাটির ঢিপি আছে অনেকদিনের পুরনো। গ্রামের বুড়ো-বুড়ীরাও বলে, তারা নাকি জন্মাবধি ওই ঢিপিটা ঠিক অমনিই দেখেছে। এই নিয়ে কত কিংবদন্তি মানুষের মুখে মুখে ফেরে, কত লোক কত গল্প বলে। কেউ বলে, এ জায়গাটার নাম ছিল আলিপুর। এখানে নরোত্তম নামে ছিল এক হিন্দু রাজা। বর্গীরা এসে আক্রমণ করেছিল সেই রাজাব প্রাসাদ। আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল রাত্রির অন্ধকারে। পুড়ে মরেছিল সবাই। সোনার নগরী ছাই হয়ে গিয়েছিল দেখতে দেখতে। তারপর সেটা পরিণত হয়েছিল পাহাড়ের মত একটা মাটির ঢিপিতে। সেই মাটির ঢিপিটাকে নিয়েই নজরুল রচনা করেছিল তার প্রথম কবিতা। একটি কবিতার নাম দিয়েছিল—'রাজার গড়' আর একটির নাম দিয়েছিল—'রাণীর গড়'।

এই কবিতা দু'টি আমাকে সে পড়তে দিয়েছিল।

ইস্কুলের ছেলে গল্প লিখছে, কবিতা লিখছে, গান গাইছে, গল্প-উপন্যাস পড়ছে—আমাদের কানে সে-সব ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। কাজেই আমাদের লিখতে হতো লুকিয়ে লুকিয়ে। পাঠক ছিলাম আমরা দু'জন দু'জনের। নজরুল তার লেখা পড়তে দিত আমাকে, আমি দিতাম তাকে।

নজরুলের প্রথম লেখা সে কবিতা দু'টি আমি রেখে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—কলকাতায় কোনও পত্রিকার আপিসে পাঠিয়ে দেবো ছাপবার জন্যে, পত্রিকা বলতে আমরা তখন চিনতাম মাত্র দু'টি পত্রিকা—একটি 'বঙ্গবাসী' আর একটি 'হিতবাদী'।

খবরের কাগজের মত মস্ত বড় একখানি কাগজে ছাপা সাপ্তাহিক পত্রিকা। শহরে লাইব্রেরী একটি ছিল, সেখানে একখানি মাসিক পত্রিকা দেখেছিলাম তার ঠিকানাও লিখে এনেছিলাম। কিন্তু পাঠাতে ভরসা হয়নি। নিয়মাবলীতে লেখা ছিল—লেখার কপি রেখে পাঠাতে হয়। কপি করবার সময়ও পাইনি।

আসানসোল থেকে একটি কাগজ বেরুতো। নাম ছিল 'রত্নাকর'। আদালতের নীলাম ইস্তাহার ছাপা হতো। একদিন রাণীগঞ্জ থেকে আসানসোল গেলাম ট্রেণে চড়ে ইস্কুল থেকে পালিয়ে। সম্পাদকের ভাগনের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সেই বলেছিল মামাকে বলে আমি ঠিক ছাপিয়ে দেবো। মামা বললে, আহা অতদূর থেকে এসেছে, রতুর বন্ধু, দাও না ছেপে। মামার সেই এক কথা! ও-সব ছাই-ভস্ম আমরা ছাপি না। শেষে অনেক করে ধরে বসতে মামা রাজী হলো। বললে—ভালো বিপদে পড়লাম দেখছি! আচ্ছা তা'হলে এক কাজ কর। ভাল দেখে চার-পাঁচটা লাইনের একটা 'ষ্টান্‌জা' (Stanza) দিয়ে যাও। আসছে মাসে দেবো ছেপে।

সেখানে দিতে ইচ্ছে করেনি। ফিরে এসেছিলাম। কবিতার সেই ক'টি পাতা কেমন করে না জানি আজও আমার কাছে রয়ে গেছে। নজরুলের নিজের হাতের লেখা। নীচে তারিখ পর্যন্ত দেওয়া আছে—১২.৪.১৭। অর্থাৎ ১৯১৭ সালের বারোই এপ্রিল। এখন থেকে উনপঞ্চাশ বছর আগের লেখা নজরুলের অপ্রকাশিত কবিতা। নজরুলের বয়স তখন বোধ করি আঠারো পেরিয়েছে। আর আমি তখন ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পা দিয়েছি।

কবিতাটি এই রকম :

রাজার গড়

ঐ—গাঁয়ের দখিনে দাঁড়ায়ে কে তুমি
যুগ যুগ ধরি একা গো।
তোমার বুকে ও কিসের মলিন রেখা গো?

এ কোন্ দেশের ভগ্নাবশেষ
কোন্ দিদিমার কাহিনীর এ দেশ?

দূর অতীতের আবছায়াটুকু রেখেছো পাষাণে ঢাকা গো।
কোন্ চিতোরের চিতার ভস্ম তোমার উরসে মাখা গো।

ওগো কে তুমি আমার পল্লী-মায়ের দুখের কাহিনী কহিছ?
নীরব নিঝুম গভীর ব্যথাটি গাহিছ?
মা নাকি ছিল রাজার দুলালী
আজ অনাথিনী পথের কাঙ্গালী

মরমের ব্যথা মরমে চাপিয়া ঝাঁও হয়ে পুড়ে গিয়েছে—
নীরব কবির নীরব ভাষায় পেলব গাথাটি গাহিছ।

কভু তোমার বক্ষ জুড়িয়া শোভিত
নরোত্তম রাজ-কেয়ারী,
মাঝে নাকি ছিল প্রাসাদ হাজার দুয়ারী।
আঁকড়ের ঝোঁপ এখন সেথায়
ঘিরেছে বোয়ান অলক্ লতায়

সকাল সাঁঝে খেলতো যেথায় সুগন্ধ ফুল কেয়ারী
হাতে হাত ধরে আসতো সেথায়—আসতো রাজার ঝিয়ারী

ঐ—তোমার শিয়রে এখনও জাগিয়া
বিশাল শিমুল গাছটি
ওগো সব গেছে, সে শুধু ছাড়েনি কাছটি।
এখনও নিশীথে কে তার শাখায়
আকুল কাঁদনে গ্রামটি কাঁপায়,

স্বপনের ঘোরে আতকে ওঠেগো মায়ের কোলে বাছাটি।
কেউ জানে না যে কত যুগ ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে গাছটি।

কাজী নজরুল ইসলাম আর আমি।

আমরা যে জায়গায় জন্মেছি, বাল্যাবধি যেখানে মানুষ হয়েছি, সেটা কয়লাকুঠির দেশ। চারিদিকে ঢেউ-খেলানো কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গা আর ধানের ক্ষেত। তারই মাঝে মাঝে কয়লার কুঠি, আর
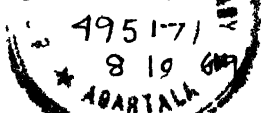
স্নিগ্ধ শ্যামল গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম। নজরুলের জন্মভূমি চুরুলিয়া গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে অজয় নদী। নদী বলতে যে-ছবি আমাদের চোখের ওপর ভেসে ওঠে এ-নদী কিন্তু সে-নদী নয়। সারা বছর নদীতে জল থাকে না। খর বৈশাখের সূর্য্যের তাপে তেতে-ওঠা বালি শুধু মরুভূমির মত ধূ-ধূ করে, হাওয়ায় ওড়ে সাদা কাশের ফুল, আর দূরে হয়ত কোন্ ঘুঘু-ডাকা প্রান্তরের পারে ছোট্ট একটি মাটির ঘরের ভেতর বসে বসে সুর করে মহাভারত পড়ে, রামায়ণ পড়ে দরিদ্র এক মুসলমানের ছেলে দুখু মিঞা, আর হিন্দুর মেয়েরা হাত জোড় করে শোনে সেই মহাকাব্যের অবিস্মরণীয় কীর্তিকাহিনী।

বর্ষায় কিন্তু এই নদীর রূপ হয় প্রলয়ঙ্করী। পশ্চিম থেকে গিরিমাটির ঢল্ নামে। দু-কূল ভাসিয়ে বয়ে যায় কদম খণ্ডীর ঘাটের দিকে—পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসকালে প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে মহাকবি জয়দেবের পুণ্যতীর্থ কেন্দুবিল্বে।

গৈরিকবসনা ভৈরবীর দেশ। মনে হয় যেন বীরভূম আর বর্ধমানের এই সঙ্গমতীর্থে অজয়ের তীরভূমির মৃত্তিকা স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে এক পিঙ্গলকেশা পিঙ্গলনেত্রা রুদ্রাণী ভৈরবী। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল!

একদিকে মৃত্তিকার ওই রুদ্রাণী রূপ, আর একদিকে আকাশে বাতাসে প্রেমিক কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দের 'দেহি পদপল্লবমুদারসে'র সুর।

এইখান থেকে এসেছে কবি নজরুল।

আমাদের ছেলেবেলার কথা কিছু বলি।

আমি পড়তাম রাণীগঞ্জ স্কুলে, আর নজরুল পড়তো শিয়াড়শোল স্কুলে। ইস্কুল দুটোর নামই শুধু আলাদা, কিন্তু দুটো ইস্কুলই খুব কাছাকাছি।

শিয়াড়শোল স্কুল শিয়াড়শোল রাজাদের স্কুল।

সেই রাজাদের অনুগ্রহে নজরুল ভর্তি হলো শিয়াড়শোল ইস্কুলে। ইস্কুলে মাইনে লাগবে না। বোর্ডিং-এ থাকবার এবং খাবার খরচও লাগবে না।

রাণীগঞ্জ থানার সামনে আমাব মাতামহ রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জির রাজবাড়ীর মতন বিরাট বাড়ী। আমি থাকি সেই বাড়ীতে, আর নজরুলের থাকবাব ব্যবস্থা হলো শিয়াড়শোল স্কুলের 'মোহমেডেন্ বোর্ডিং'-এ। আমাদেরই বাড়ীর কাছে একটি পুকুরের ধারে ছোট্ট একটি বাড়ী। তাবই একখানি ঘরে থাকে পাঁচজন মুসলমানের ছেলে। এই পাঁচটি ছেলের ভেতর একটি ছেলে হলো দুখু মিঞা। ভাল নাম—কাজী নজরুল ইসলাম।

একদিকের একটি জানলার পাশে ছোট একটি খাটিয়া। খাটিয়ার ওপর পরিষ্কার একটি বিছানা পাতা। দেখলেই চেনা যায়—অগোছালো কোন্ এক ছন্নছাড়া ছেলের আস্তানা।

এই ঘরে থাকতো আরও চাবজন ছাত্র। কি তারা পড়তো, কোথায় তাদের বাড়ি কিছুই জানি না। তবে তাদের মধ্যে একজনের কথা আমাব আজও বেশ মনে আছে! তার ভাল নাম আমার জানা নেই। ডাক-নাম ছিল ছিনু। প্রথম যেদিন তাকে দেখলাম—দেখলাম, ঝাঁটা হাতে নিয়ে সে ঘর ঝাট দিচ্ছে। সে আজ কতদিনের কথা, তবু আজও মনে আছে, তাব কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তাম আমবা। সামান্য কথা কিন্তু বলবার ভঙ্গী তাব এমনিই রহস্যময় যে, না হেসে কেউ থাকতে পারতো না।

নজরুলকে সে খুব ভালবাসতো।

নজরুলের বিছানার চাদর কাচতো, জামায় কাপড়ে সাবান দিয়ে দিতো। বই-পত্তর গোছ-গাছ করে রাখতো।

ইস্কুলের ছুটির পর'বইখাতা বাড়িতে রেখে কিছু খেয়েই ছুটতাম ওদের বোর্ডিং-হাউসে। আমাকে দেখলেই খেজুর পাতাব একটা

চাটাই নিয়ে ছিন্নু আসতো ছুটে। বলতো, দাঁড়াও, এইটে আগে পেতে দিই। তা' পরে বসো।

এই বলে খাটিয়ার ওপর থেকে বই-টই সরিয়ে সেই চাটাইটা বিছিয়ে দিয়ে বলতো, নাও এইবার শোও, বোসো, যা খুশি তাই কর।

বিছানার চাদরটা ময়লা হলে তাকেই কাচতে হবে—তাই তার এই সতর্কতা।

ছিন্নু বলে বসলো—বিছানার ওপর তোমরা মই-মাড়ন্ কর আর আমি মরি তোমার চাদর কেচে।

নজরুল হো হো করে হাসতো। পবিত্র নির্মল হাসি! নিতান্ত সহজ সরল শিশুর মত নিষ্কলঙ্ক সে হাসি!

বিস্কুটওলা এসে দাঁড়াতো জানলার পাশে। মিশমিশে কালো গায়ের রং, গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত। বাঁশের চুপড়িতে নানারকমের বিস্কুট পাঁউরুটি।

ছিন্নু বলতো, কি হে বাপু তুমি বামুন তো?

বিস্কুটওলা বলতো, হাঁ বাবু, আমার বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি।

ছিন্নু বলতো, দেখো মিছে কথা বলে আমাদের জাত মেরে দিও না। দাও। ওই বাবুদের দাও, আমি ততক্ষণ চা আনি।

নজরুলের টাকা-পয়সা থাকতো তার বিছানার তলায়। টাকা-পয়সা বলতে শিয়াড়শোল রাজবাড়ি থেকে পাওয়া মাসিক বৃত্তির কয়েকটি টাকা। ইস্কুলে বেতন দিতে হতো না, বোর্ডিং-এর খরচ দিতে হতো না। কিন্তু সে টাকা আর কতক্ষণ! বিছানার তলাতেই থাকতো, সেইখান থেকেই খরচ হতে হতে একদিন ফুরিয়ে যেতো। টাকার বেশির ভাগ নিতো এই বিস্কুটওলা। তারপর চলতো ধার। সে ধার শোধ করতাম হয় আমি, নয় আমাদের আর-এক সহপাঠী বন্ধু শৈলেন ঘোষ। সে ছিল ক্রিশ্চান। বড় ভাল ছেলে। সে দিত।

একবার একটা ভারি মজা হয়েছিল। মাসের প্রথমেই

রাজবাড়ী থেকে সাতটি টাকা নজরুল নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। বোর্ডিং-এ এসে দেখে, তার ছোট ভাই আলি হোসেন এসেছে গ্রাম থেকে। সচ্ছল সংসার নয়। অনটন সব সময়। দারিদ্র্যের জ্বালা লেগেই আছে। দুঃখ কষ্টের কথা পাছে বেশি শুনতে হয় তাই তাড়াতাড়ি সাতটি টাকাই আলি হোসেনের হাতে দিয়ে নজরুল তাকে বিদেয় করে দিয়েছে।

গিয়ে দেখি, ছিন্নু কি যেন বলছে আর নজরুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

যাবামাত্র নজরুল বললে, চল বেড়িয়ে আসি।

আমি আর বসলাম না। বললাম, চল।

ছিন্নু বললে, জানো মিঞা-সাহেব, দুখু মিঞার ছোট ভাইটার বিড়ি-সিগ্রেটের খরচই মাসে সাত টাকা।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। ছিন্নু বুঝিয়ে দিলে।

বললে, ওই সাতটা টাকা ওর মায়ের হাতে দেবে কিনা ওর ভাইটা! বিড়ি-সিগ্রেট খেয়েই ফুঁকে দেবে।

হাসতে হাসতে নজরুল বললে, বিড়ি-সিগ্রেট ও খায় না।

ছিন্নু বললে, খায় না—খাবে।

নজরুল বললে, আর তুই যে হুঁকো টানিস!

ইস্কুলের ছেলে—হুঁকো টানে! তাজ্জব ব্যাপার!

ছিন্নুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি?

মুহূর্তে ছিন্নু যেন মিইয়ে গেল। কথাটা বলতে তার ভারি লজ্জা! না মিঞা-সাহেব, মিছে কথা। আমি চা আনছি। বোস্। বলে সে পালি য়েগেল।

নজরুলও যেন বাঁচলো সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থেকে রেহাই পেয়ে।

মিঞা-সাহেব!

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি, বিস্কুটওলা এসে দাঁড়িয়েছে। বললে, ঝালরুটি এনেছি। দেবো?

লঙ্কা নুন আর মরিচের গুঁড়ো দিয়ে শক্ত শক্ত এক রকম পাঁউরুটি তৈরি করে ওরা। তাকেই বলে, ঝালরুটি। আমিই তাকে আনতে বলেছিলাম একদিন।

বললাম, দাও।

কিন্তু তুমি আমাকে মিঞা-সাহেব বললে কেন হে?

ছিনু এলো একটি কলাইকরা থালার ওপর ডাঁটভাঙা কাপে চা নিয়ে। বিস্কুটওলাকে দেখেই বললে, তুমি বাপু আমাদের জাত মেরে দিয়েছ। কাল থেকে আর এ পথে এসো না।

বিস্কুটওলা হাসতে লাগলো।

ছিনু বললে, হাসি নয়। তুমি বামুন নও, আমি সব খবর নিয়েছি।

বিস্কুটওলা কথাটা গ্রাহ্যই করলে না। আনা-চারেকের ঝাল-রুটি দিয়ে সে ধার রইলো বলে চলে যাচ্ছিল। আমি তার দাম মিটিয়ে দিলাম।

ছিনু বললে, তুমি বেহেস্তে যাবে মিঞা-সাহেব। খোদাকে আজ রাত্রেই আমি বলে দেবো।

—রাত্রে তোমার সঙ্গে বুঝি দেখা হবে খোদার?

ছিনু বললে, হ্যাঁ রোজ রাত্রে তামাক খেতে আসে।

ছিনুর এই সব তুচ্ছ সামান্য কথা শুনতাম আর হেসে হেসে পেটে খিল্ ধরে যেতো।

ছিনুকে বলেছিলাম, আমাকে মিঞা-সাহেব বোলো না ছিনু। আজ বিস্কুটওলা পর্যন্ত আমাকে মিঞা-সাহেব বলে ডেকে গেল।

ছিনু বললে, তোমার দাদামশাই-এর খেতাব রায়-সাহেব। সরকার দিয়েছে। আর তোমার খেতাব মিঞা-সাহেব। আমি

দিলাম। আমি—এই ছিনু-সরকার। আজ রাত্রে খোদাকে বলে আমি ওটা মঞ্জুর করিয়ে নেবো।

নজরুল আর আমি। একদিন বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলাম। ফিরতে গা-ঘোর সন্ধ্যে হয়ে গেল। দেখি, বোর্ডিং-এর পেছন দিকে আগাছার জঙ্গলের ভেতর লণ্ঠন নিয়ে কে যেন কি খুঁজছে।

আবদুল ছিল দোরের কাছে দাঁড়িয়ে। আবদুল রান্নাও করে, চাকরের কাজও করে। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, লণ্ঠন নিয়ে ওই দিকটায় কে গেল?

আবদুল বললে, ছিনু মিঞা তার হুঁকো খুঁজছে।

—হুঁকো খুঁজছে?

আবদুল বলল, হ্যাঁ বাবু, তোমাদের ইস্কুলের পণ্ডিত এসেছিল তোরাব-সাহেবের কাছে। ছিনু মিঞা ওই জানলার কাছে বসে বসে তামাক খাচ্ছিল, দেখতে পায়নি। তার পর যেই পণ্ডিতকে দেখা, আর অমনি আগুন-সুদ্ধু হুঁকো-কলকে ওই জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়েছে ওই দিকে।

—তাই বুঝি?

আবদুল বললে, হ্যাঁ। ওদিকে ভাত চাপিয়েছি। এখনও লণ্ঠনটা আনলে না।

পরের দিন দেখলাম, ছিনুর হুঁকোটি জানলার ঠিক পাশেই নামানো। নারকেলের মালার এখানে-ওখানে সাদা চুন লাগানো হয়েছে। পাথরের ওপর পড়ে ফেটে গেছে হুঁকোটি।

ছিনু মিঞার সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে সেই কতদিন আগে।

রাণীগঞ্জে থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন শুনলাম, ছিনু দেশে চলে গেছে। দেশে গিয়েছে 'শাদি' করবার জন্যে।

কিন্তু সেই যে গেল, সে'আর ফিরে এলো না।

তার স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে ভাঙা চুনকামকরা সেই হুঁকোটি পড়ে রইলো বারান্দার এক কোণে।

এখন থেকে ছ' সাত বছর আগে, কি একটা কাজের জন্য গিয়েছিলাম আসানসোল। ষ্টেশনে ট্রেনটা গিয়ে দাঁড়ালো সন্ধ্যায়। চারিদিকে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে। দিনের মত পরিষ্কার। প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে, শৈলবাবু!

এ-নাম ধরে কে ডাকলে? থমকে দাঁড়ালাম।

পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখি, একটি লোক ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ মুসলমান। মুখে কাঁচা-পাকা কয়েক গাছা পাতলা দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। কাছে এসে সে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ।

—চিনতে পারছেন শৈলবাবু?

চেনবার মত কিছুই ছিল না সে-মুখে, তবু চিনতে দেরি হলো না। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধ করি এমন একটা সময় আসে, তখন যা-কিছু সে দেখে, শুধু চোখ দিয়ে দেখে না, মন দিয়ে দেখে, তাই মন তাকে আর ভুলতে পারে না সারা জীবনেও। আর সে সময়টা মানুষের কৈশোর। তাই বোধ হয় আমরা ইস্কুলের সহপাঠীদের কোনদিন ভুলতে পারি না। কিন্তু কলেজের বন্ধুদের ভুলে যাই।

বললাম, চিনেছি। তুমি ছিনু।

কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রেল-কোম্পানির একজন কর্মচারী এসে তার একখানা হাত ধরে টানতে আরম্ভ করলে। বললে, এসো, টাকা দেবে এসো।

কি হয়েছে মশাই?

রেল-কর্মচারী বললে, আর বলেন কেন, ধ্যাটা পাজীর একশেষ। যাবে বলছে জামুড়িয়া। ধানবাদ থেকে টিকিট, কিনেছে কুলটির।

নেমেছে আসানসোলে। জিজ্ঞাসা করলুম তো পাগলের মত আবোল-তাবোল যা-তা বলতে লাগলো, তারপর উত্তম-মধ্যম দু' এক ঘা দিতেই ঠিক-ঠিক জবাব দিলে।

বলেই সে ছিনুর মুখের পানে তাকিয়ে ভেংচি কেটে বললে, ব্যাটা আবার বলে কিনা আমার মাথার ঠিক ছিল না!

কর্ত্তব্যপরায়ণ রেল-কর্মচারীটিকে শান্ত হবার জন্যে আমি অনুরোধ করলাম। বললাম, থামুন। ও চুরিও করেনি, ডাকাতিও করেনি। ওকে আপনি মারলেন কেন?

লোকটি আমার মুখের দিকে কট্‌মট্‌ করে একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর মুহূর্তে কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। বললে, আপনাকে ডেকে আনলে বুঝি? না না মারবো কেন, মারিনি, মারিনি, এমনি দু' একটা মানে—ধমক্‌-ধামক্‌—মানে, যান আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান, আমি একটা রসিদ লিখেই ওকে ছেড়ে দিচ্ছি।

বললাম, কিন্তু ও যদি আপনাকে না ছাড়ে!

—তার মানে?

বললাম, মানেটা খুব সোজা। আপনি ওকে উত্তম-মধ্যম যা দিয়েছেন, ওই-বা সেগুলো চুপচাপ হজম করবে কেন? ছিনু, দাও তো একটি একটি করে গুনে গুনে সেগুলি ওঁকে ফেরত দিয়ে। তারপর উনি গিয়ে রসিদ কেটে আনুন, এক্সেস্‌ ভাড়া যা লাগে আমি দিচ্ছি। কুলটি পর্যন্ত তোমার যে টিকিটখানা ছিল সেটা কোথায়?

ছিনু বললে, আমার কাছেই আছে।

বলেই সে তার হাতের বোঁচকাটি নামিয়ে শতচ্ছিন্ন কোটের এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াতে লাগলো।

ঠিক সেই সময় ওদিকের প্ল্যাটফর্মে ডাউনের একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়ালো।

রেল-কর্মচারীটি বললে, দেখুন, ফাইভ-ডাউন এসে গেল। দাঁড়ান মশাই, আমার চাকরিটা বজায় রাখি আগে।

এই বলেই আর এতটুকু দেরী না করে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে লাগলে সেইদিকে।

ছিনু ততক্ষণে বের করেছে তার হলুদ রঙের টিকিটখানি।

বললাম, থাক্, ওটা রাখো তোমার পকেটে। উনি বোধ হয় আর আসবেন না।

ছিনু বললে, লোকটি পালিয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ। চলো, ষ্টেশনের বাইরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি। কতদিন পরে দেখা হলো বল তো?

ছিনু তার বোঁচকাটি তুলে নিয়ে ধীরে ধীবে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলো। বললে, বেঁচে থাকলে দেখা হয় তা'হলে? আমি আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি।

বললাম, ও কি ছিনু, তুমি আমাকে 'আপনি বলছো কেন?

ছিনু বললে, বলবো না?

—কেন বলবে? কখনও বলেছ?

ছিনু এতক্ষণ পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। বললে, ভয়ে ভয়ে বলছিলাম মিঞা-সায়েব। দুখু মিঞা কেমন আছে ভাই?

তার কি হয়েছে তুমি জানো?

ছিনু বললে, শুনেছি সে নাকি পাগল হয়ে গেছে: যেদিন শুনেছিলাম সেদিন লুকিয়ে কি কান্নাই-না কেঁদেছি। আচ্ছা ভাই এখন কি করে সে? তোমাকে চিনতে পারে?

বললাম, না। চিনতে পারে না। কাউকে নয়।

পাশেই একটা চায়ের দোকান। ছিনু আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসালে। একটা বেঞ্চির ওপর পাশাপাশি বসলাম দু'জনে।

নজরুল সম্বন্ধে অনেক কথা সে জানতে ''াইলে।

কতরকমের কত প্রশ্ন!

যতদূর সম্ভব বলে চলেছি। মাঝখানে' দোকানদার চায়ের দাম

চাইলে। দিতে যাচ্ছিলাম। ছিনু আমাকে কিছুতেই দিতে দিলে না। পকেট থেকে একটুকরো ন্যাকড়াব একটি খুঁটের গিঁট খুলে পয়সা বেব করে চায়ের দাম দিলে।

জিজ্ঞাসা করলে, কিছু খাবে?

বললাম, না। তুমি খাবে তো খাও।

ছিনু বললে, না। কিন্তু দু' কাপ চা নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি এবার যদি না উঠি তো তাড়িয়ে দেবে।

উঠতেই হলো!

কিন্তু আমাদেব কথা তখনও শেষ হয়নি।

ছিনু বললে, তোমবা ভাই কত বড় হযেছ। যেখানেই যাই সেইখানেই শুনি তোমাদেব কথা। লোকে যখন বলে, আমার বুকখানা তখন দশ হাত হযে যায়। কত লোকেব কাছে আমি বলি তোমাদের কথা। কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস কবতে চায় না। কতটুকুই-বা আমি জানি? কত দিনই-বা ছিলাম তোমাদেব সঙ্গে।

বড় রাস্তার ধাবে ধাবে কথা বলতে বলতে চলেছি। বাজারেব কোলাহল ছাড়িয়ে পূবমুখে চলেছি আমরা গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-বোড ধরে। পথের দু'পাশে বড় বড় গাছ। নিবিড়, ছাযাচ্ছন্ন। বললাম, এসো, বসি এই গাছের তলায।

ছিনু বললে, আমিও ভাবছিলাম বলি। কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছিল না।

গাছের নীচে মাটিতে বসলাম। বললাম, আমাদেব কথা তো সবই শুনলে ছিনু, এবার তোমার কথা বল। এখন কি করছ?

কথাটা শুনে ছিনু যেন অবাক হয়ে গেল। তার আবার কথা কি? পৈতৃক বিঘে-দশেক ধানের জমি, খড়ের চাল-দেওয়া খান-তিনেক মাটিব ঘর, একটি গাই আর দুটি বলদ। চাষী মুসলমান গৃহস্থ। আমরা আবার মানুষ! তার আবার কথা! কলকাতা শুনেছি আজব শহর—তাই দেখলাম না আজ পর্যন্ত!

বললাম, আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তুমি একবার এসো। কবে কোন্ ট্রেনে আসছো জানিয়ে আগে একখানা চিঠি দিও। স্টেশন থেকে তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার দুখু মিঞাকে দেখে আসবে।

ছিনু বললে, সে তো আমাকে চিনতে পারবে না মিঞা-সাহেব।

বললাম, না, তা পারবে না।

—সে তো আমি সহ্য করতে পারবো না! ছিনু বললে, নাঃ, যাওয়া হবে না।

একটা কাগজে লিখছিলাম আমার ঠিকানা।

ছিনু বললে, দাও ওটা। রেখে দেবো বাড়িতে। দেখাবো সবাইকে।

বললাম, না না ছিনু, একটিবার এসো কলকাতায়।

ছিনু আমার ঠিকানাটি যত্ন করে তার পকেটে রেখে বললে, যেতে পারতাম। আমার বড় ছেলেটা যদি বেঁচে থাকতো। চাকরি করছিল ধানবাদে। দশ-বার টাকা করে দিচ্ছিল মাসে মাসে। কিন্তু অত সুখ আমার কপালে সইলো না। খবর পেলাম তার কলেরা হয়েছে। গিয়েছিলাম। দেখতেও পেলাম না।

ছিনুর ঠোঁট দুটি থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। কথা বলতে পারছিল না। একটা ঢোক্ গিলে সামলে নিলে। তারপর আবার শুরু করল, পরশু রাত্তিরে শেষ হয়ে গেছে। আমাদের জাতভাই-ই ছিল সব—দিয়েছে মাটি দিয়ে। জিনিসপত্র বলতে কিছুই পেলাম না। মেরে দিয়েছে। দিকগে। মানুষটাই গেল, তার আবার জিনিসপত্র!

কাপড়ের পোঁটলাটি দেখিয়ে বললে, যা ছিল এই নিয়ে এলাম।

নিজের গায়ের ছেঁড়া কোটটি দেখিয়ে বললে, থাকবার ভেতর ছিল এই কোটটি। আর—

পকেট থেকে পোস্টাপিসের একটি পাশ-বই বের করে তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, তেরটি টাকা।

টস্ টস্ করে দু'ফোঁটা চোখের জল পড়লো পাশ-বই-এর ওপর।

বইটি বন্ধ করে পকেটে রাখলে। বললে, এ কি আর তুলতে পারব আমি? দেবে না আমাকে। সাদি দিয়েছিলাম। বৌ আছে আর ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে। থাকে যদি আমার কাছে তো খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করতে হবে আমাকেই।—হুঁঃ! আমি যাব কলকাতায়! তবেই হয়েছে! দাও, তোমার একটা সিগ্রেট দাও—খাই।

সিগ্রেট ধরিয়ে ছিনু বলতে লাগলো, কুলটিতে আছে ছোট ছেলে। রাজমিস্ত্রির কাজ বেশ ভালই শিখেছে। সিমিন্টমাটির ঢালাই-এর কাজও করতে পারে। রোজ চার টাকা, সাড়ে চার টাকা রোজগার। বৌ আছে আর একটা মেয়ে আছে। আলাদা হেঁসেল। আলাদা রান্নাবান্না করে। বাপকে একটি পয়সাও দেয় না। আবার শুনছি সে নাকি কুলটিতে আর একটা বিয়ে করেছে। সত্যি কিনা জানবার জন্যে কুলটির টিকিট কেটেছিলাম। কিন্তু বড় ছেলেটার কথা ভাবতে ভাবতে এমনি উদাস হয়ে গেলাম, কখন কুলটি পেরিয়েছি, সীতারামপুর পেরিয়েছি বুঝতেও পারিনি। আসানসোলে এসে তবে হুঁশ হলো।—নেমে পড়লাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখন বাড়ি যাবে কেমন করে ছিনু?

দূরে একখানা বাস দাঁড়িয়েছিল। ছিনু আঙুল বাড়িয়ে সেই বাসটা দেখিয়ে বললে, আমি ওই বাসে চড়ে বসবো। নামবো একেবারে বাড়ির দরজায়।

এই বলে সে তার বোঁচকাটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, তোমাকে অনেক দেরি করে দিলাম মিঞা-সাহেব। আর ক'দিনই বা বাঁচবো! তবু যাবার আগে একবার দেখা হলো।

তাড়াতাড়ি গিয়ে ছিনু 'বাসে' চড়ে বসলো।

সেই ছিনু মিঞা!—প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠ এক কিশোর ছাত্র! যার প্রতিটি কথায় মনের অন্ধকার কেটে যেতো। প্রাণ খুলে হেসে বাঁচতাম আমরা।

আজ এই শীর্ণ শোকাতুর বৃদ্ধের ভেতর আনন্দোচ্ছল প্রাণবন্ত সেই ছিনুকে খুঁজে পেলাম না।

কলকাতায় ফিবে এসেচি।

ছিনুর কথা সবাব আগে যাকে জানানো উচিত—সে-ই বা কোথায়?

সেও যে আত্মসমাহিত, নির্বিকার।

এ-কথা আমি বলবো কাকে?

দুই

রাণীগঞ্জ ইস্কুলটি তখন ছিল খানিকটা একতলা, খানিকটা দোতলা। দোতলার একটি ঘরে আমাদের ক্লাস বসতো।

ঘরের পশ্চিমদিকে বড় বড় জানালা। সেই খোলা জানালার পথে দেখলাম, দলে দলে লোক ছুটছে রেল-লাইনের দিকে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। ইস্কুলের ছেলে—ক্লাশ ছেড়ে যেতেও পারি না। সবাই ভাবছে, ছুটি হোক, ছুটি হলেই ছুটবো ওইদিকে।

ছুটি হলো। বাইরে বেরিয়েই শুনলাম, সাঁওতালদের একটা মেয়ে নাকি কাটা পড়েছে ট্রেনের তলায়। তার দেহটা পড়ে আছে লাইনের ধারে।

ইস্কুলের ছেলেরা অনেকেই গেল দেখতে। আমার কিন্তু একা যেতে মন সরলো না। কিছুদিন ধরে কি যে হয়েছে—নজরুলের সঙ্গে দেখা না হলে বিকেলটা মনে হয় মাটি হয়ে গেল।

নজরুল পড়ে শিয়াড়শোল ইস্কুলে, আমি পড়ি রাণীগঞ্জে। এক এক সময় আফশোষ হয়—এক ইস্কুলে পড়লাম না কেন? কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

বাড়িতে বই-খাতা রেখেই ছুটলাম।

বাগানে গিয়ে দেখি, পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটের চত্বরে শুয়ে আছে নজরুল। দু'হাত দিয়ে বুক বাজাচ্ছে, গুঁক গুঁক করে ডুগি-তবলার বোল বলছে আর গান গাইছে।

আমাকে দেখেই তার সঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল। উঠে বসেই বললে, অনেকক্ষণ এসেছি।

—বেশ করেছ! চল।

কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়েই দু'জনে ছুটলাম রেল-লাইনের দিকে। পাড়ার ভেতর দিয়ে, শেকার-সাহেবের বাঙলো পেরিয়ে, অলিতে-গলিতে এঁকেবেঁকে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন লাইনের ধারে গিয়ে পৌঁছোলাম, দেখি--সব ভোঁ-ভোঁ। কেউ কোথাও নেই। গোটাকয়েক ছাগল চরছে শুধু লাইনের দু'পাশে।

কাকেই-বা জিজ্ঞাসা করি ?

নজরুল তো দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে গান ধরে দিলে :

'আহা কি দেখালে ছবি !
শ্যামের বামে রাই-কিশোরী !'

কাঠের স্লিপারের ওপর পা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা।

—ও মশাই, শুনছেন ?

এক ভদ্রলোক লাইন পার হচ্ছিলেন ছাতি মাথায় দিয়ে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, সকালে এখানে একটা মেয়ে কাটা পড়েছিল জানেন ?

—জানি।

—কি হলো বলতে পারেন ?

পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

বাস, খতম। কিছুই আমরা দেখতে পেলাম না।

সামনে রাণীগঞ্জ যাবার পাকা রাস্তা। রাস্তার দু'দিকে বড় বড় গাছ। লাইন থেকে নেমে সেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কোথায় যাব ভাবছি, এমন সময় নজরুল বললে, আমি আর হাঁটতে পারছি না। বসলাম।

গাছের তলায় কচি কচি ঘাস গজিয়েছে। শাখায়-প্রশাখায় পত্রে-পল্লবে একাকার, মাথার ওপর আকাশ দেখা যায় না। ছায়াস্নিগ্ধ

জায়গাটি বড় মনোরম। ঘাসের ওপর নজরুল শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে বুক বাজিয়ে আবার শুরু হলো তার সঙ্গীতচর্চা।

গাছের তলায় আমরা ছুটি পাশাপাশি শুয়ে!

হঠাৎ মোটরেব হর্ণের শব্দে চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি, পথের ওপর একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছে। হুড্খোলা মোটর। যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি ইংরেজ। আমাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন তিনি বললেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

নজরুল বললে, আমাদের ডাকছে রে।

গেলাম এগিয়ে। কিন্তু কি যে বলছেন ভদ্রলোক, এক বর্ণও বুঝলাম না।

সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ছি। ছাপা বই পড়তে পারি। মানেও বুঝি কিছু কিছু। কিন্তু খাস ইংরেজের কথা বুঝবার ক্ষমতা তখনও হয়নি। নজরুল তাকাচ্ছে আমার দিকে, আমি তাকাচ্ছি তাব দিকে। গাড়ির পেছনে যে মেয়ে ছুটো বসেছিল, তারা মুখ টিপে টিপে হাসছে।

সাহেবের পাশে যে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তিনি গাড়ির দরজা খুলে নামলেন। আমাদের কাছে এসে বললেন, ছেলেসকল! এসোনসোল কেটো দূর বলিতেছি।

নজরুল বলে উঠল, দে গরুর গা ধুইয়ে! তা এতক্ষণ বলতে হয় মা-ঠাকরুণ!

এবার মা-ঠাকরুণের পালা! কিছু বুঝতে না পেরে তিনি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন আমাদের মুখের দিকে।

বললাম, ভুল পথে চলে এসেছেন আপনারা।

নজরুল বললে, পিছু হটে গিয়ে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধরতে হবে।

বাঙলা-জানা মেমসাহেব ভেবেছিলাম এবার সবই বুঝতে পারবেন। কিন্তু 'ভুল' কথাটা তখন তাঁর মগজে ঢুকে গেছে। এখনও আমার মনে আছে—কি বিপদেই না পড়েছিলাম সেদিন!

আমরা যত বলি—'ভুল হয়েছে আপনাদের', উনি তত বলেন, 'নো'। ভুল আমার হইটেই পারে না।'

তাঁর সে কী রাগ!

প্রথমে বুঝতে পারিনি তাঁর রাগের কারণটা। পরে বুঝেছিলাম।

ভদ্রমহিলা ভেবেছিলেন, আমরা বুঝি তাঁর বাঙলা ভাষার ভুলের কথা বলছি।

তাঁরও দোষ নেই। যতই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, একদিক থেকে যুবতী মেয়ে দুটো খিল খিল করে হেসে ওঠে আর একদিক থেকে আমাদের দুর্বোধ্য দেশী ভাষায় নজরুল মজার মজার টিপ্পনি কাটতে থাকে।

শেষে অতিকষ্টে গ্রামার বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে মেমসাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হলো!—ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার বাই মিষ্টেক মেমসাহেব। ইট ইজ রাণীগঞ্জ। ইট ইজ নট আসানসোল।

নজরুল বললে: ইউ উইল হ্যাভ টু গো ব্যাক অ্যাণ্ড ক্যাচ গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড।

এইবার বাধল আর-এক বিপদ।

কোথায় গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড? কোনদিকে?

অথচ সেই রাস্তা ধরেই তাঁরা এসেছেন।

হাত বাড়িয়ে, আঙুল বাড়িয়ে, লেফট বলে, রাইট বলে, এদিকে ঘুরে, ওদিকে ঘুরে, কিছুতেই যখন তাদের বুঝিয়ে দিতে পারলাম না, মেমসাহেব নিজেই তার মীমাংসা করে দিলেন। হাতে ধরে আমাদের দু'জনকে তুলে নিলেন তাঁর গাড়িতে। আমরা পথ-প্রদর্শক। পথ দেখিয়ে তাঁদের নিয়ে যেতে হবে। ধরিয়ে দিয়ে আসতে হবে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড।

গাড়িতে চড়তে পেয়ে আমাদের সে কি উল্লাস! মোটরগাড়ি তখন আমাদের ওদিকে একরকম নেই বললেই হয়।

গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া হলো। আমরা দু'জন বসেছি সুমুখের সিটে—একেবারে সাহেবের পাশে। মেমসাহেব গিয়ে বসলেন পেছনে—তাঁর দুই কন্যার সঙ্গে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শহরের পথে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে!

গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড সেখান থেকে খুব কাছে নয়। যাবার সময় না হয় মোটরে গেলাম, কিন্তু ফেরবার পথে?

নজরুলকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, আসবে কেমন করে?

—আরামসে—পায়ে হেঁটে।

বললাম, অনেক রাত্রি হয়ে যাবে।

নজরুল বললে, হোক না।

বললাম, তোমার কি! তোমাকে তো আর কেউ কিছু বলবে না, আমাকে কিন্তু কৈফিয়ত দিতে হবে।

নজরুল বললে, তাহলে অতদূর গিয়ে কাজ নেই।

নামবার ইচ্ছা তারও ছিল না, আমারও না। কিন্তু বাধ্য হয়ে নামতে হলো।

ফিডার রোডের ওপর খাঁড়গুলির মাথায় গাড়ি থামালাম। বললাম, এবার আপনারা সোজা চলে যান। গিয়ে যে বড় রাস্তায় পড়বেন, সেইটেই গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড। সোজা বাঁদিকে চলে যাবেন যেখানে দেখবেন—রাস্তার দু'পাশে বড় বড় বাড়িঘর, দোকান পসরা, হাট-বাজার, সেইটেই জানবেন আসানসোল।

এই বলে আমরা নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে।

এইবার ধন্যবাদ দেবার পালা। তখন আমরা ইস্কুলের ছাত্র। তখন বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি—জাতি হিসাবে ইংরেজ অতি বিনয়ী ও ভদ্র।

আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে অনায়াসে গাড়ি ছুটিয়ে

তারা চলে যেতে পারত। আমরা কতটুকু উপকারই-বা করেছি তাদের। তাদেরই গাড়িতে চড়ে শুধু পথ দেখিয়ে দিয়েছি।

এই কৃতজ্ঞতার ঋণটুকু তারা পরিশোধ না করে সেখান থেকে নড়ল না। সাহেব নামল, মেমসাহেব নামল, এমন কি মেয়ে দুটিও নামল গাড়ি থেকে। তারপর সবাই আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ!

ভদ্রমহিলা শুধু হ্যাণ্ডশেক্ করে ক্ষ্যান্ত হলেন না। সবার শেষে দু'হাত দিয়ে তিনি আমাদের হাত দুটি বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড!

তারপর জনবিরল সেই শহরতলীর পথের ওপর দিয়ে স্বল্পালোকিত সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়িখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে আর কোনদিনই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না জানি। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, সম্পূর্ণ অপরিচিতা, অনাত্মীয়া এই ভদ্রমহিলা। তবু এই মুহূর্তটি আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার জীবনে!

বাড়ি ফেরার পথে নজরুল বলেছিল, এবার ইংরেজিটা শিখতে হবে।

সেকেণ্ড মাষ্টার বলেছিলেন, ইংরেজি শিখতে হলে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ো, আর ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকে ইংরেজি গল্পের বই নিয়ে গিয়ে পড়বার চেষ্টা কোরো। তাহলে তাড়াতাড়ি শিখবে।

আমাদের বাড়িতে আসতো দু'খানা ইংরেজি কাগজ। ইংলিশ-ম্যান আর হিন্দু পেট্রিয়ট।

কয়েকদিন চেষ্টা করলাম পড়বার। কিন্তু ভাল লাগল না। হিন্দু পেট্রিয়ট খুলে ছবি দেখতাম শুধু।

ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকে বই আনতে আরম্ভ করলাম। দু'চার পাতা পড়ি আর শক্ত কথার মানে উদ্ধার করতে ডিক্সনারী খুলি।

এমনি করে অভিধান খুলে মানে বুঝে বুঝে গল্পের বই পড়তে ভাল লাগল না। বই আনি আর ফেরত দিই। আবার আনি, আবার ফেরত দিই। এমনি চলে।

বই আর আনবো না বলে প্রতিজ্ঞা করে লাইব্রেরীতে সেদিন গিয়েছিলাম বই ফেরত দিতে।

লাইব্রেরিয়ান-ভদ্রলোক লজ্জায় ফেলে দিলেন। বইখানা ফেরত নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এমনি করেই পড়তে হয় পড়ে পড়ে আলমারি প্রায় সাফ করে আনলে। এইবার 'মেরি কোরেলি' ধর।

এক গাদা ছেলের মাঝখানে এই কথা শুনে আর খালি হাতে ফেরা হলো না। বললাম, দিন আজ একখানা মেরি কোরেলিই দিন।

'ভেনডেটা' নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

নজরুলের কাছে গিয়ে দেখি সেও দু'খানা বেশ মোটা মোটা বই এনেছে তাদের ইস্কুল থেকে। বই দু'খানার নাম আজ আর ঠিক মনে নেই।

আমি যদিই বা অতি কষ্টে মেরি কোরেলি প্রায় শেষ করে এনেছিলাম, নজরুল তার বইয়ের পাতাও কোনদিন উল্টে দেখেনি। প্রায়ই দেখতাম বই দু'খানা তার ডুগিতবলার কাজ করছে। মোটা বই—বাজাবার খুব সুবিধে হয়েছিল।

আমাদের বাড়ির পেছন দিকে মস্ত বড় একটি বস্তির একটেরে ছিল একটি বাগানবাড়ি। সেইখানে একজন সাহেব থাকতো। সাহেবের পুরো নামটি কি ছিল জানি না, আমরা তাকে শেকার-সাহেব বলে জানতাম। সাহেবের বয়স ছিল বোধ করি পঞ্চাশের কাছাকাছি।

সেই শেকার-সাহেবকে প্রায়ই দেখি আমাদের বাড়ির সুমুখ দিয়ে যাওয়া-আসা করে। বেঁটে-খাটো মোটাসোটা মানুষটি, চোখে চশমা আর হাতে একটি মোটা লাঠি। কোনদিন দেখি, বাজারের থলে

হাতে নিয়ে বাজার করতে যাচ্ছে, আবার কোনদিন দেখি, চেন দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিন তাকে দেখেই হঠাৎ আমার মনে হলো—ভাল ইংরেজি শেখবার এই একটা সুন্দর পথ আছে।

ছুটে গিয়ে ধরলাম সাহেবকে।—গুড মর্নিং মিস্টার শেকার।

শেকার-সাহেবের সঙ্গে সেদিন কুকুর ছিল না। নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম। সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, মর্নিং, হু আর ইউ?

বললাম, Rai Shaheb M. Chatterjee's grandson.

সাহেব আমার কাঁধে হাত রাখলে। বললে, ভাল। কি বলছো? বাংলায় বল। আমি বাংলাও জানি।

সর্বনাশ! এ বলে কি!

বললাম, না, বাংলায় বলব না। ইংরেজিতে বলব। I shall go to your house.

ভেবেছিলাম, সাহেব ইংরেজিতে জবাব দেবে। কিন্তু পরিষ্কার বাংলায় বললে, যেয়ো। পয়সা নিয়ে যেয়ো কিন্তু। দু'আনায় একটা মস্ত বড় পেঁপে দেবো, পেয়ারা দেবো আনায় দুটি।

সাহেব গরীব। পেঁপে, পেয়ারা, ডিম, কলা বিক্রি করে জানি, কিন্তু ইংরেজিতে কথা যদি সে না বলে?

নিশ্চয়ই বলবে। আমাদের উদ্দেশ্য সাহেবকে বুঝিয়ে বলব—তাহলেই বলবে, এই আশা নিয়ে সেদিন সাহেবের বাড়ি গেলাম নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে।

বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে শেকার-সাহেবের বাংলো। চারদিকে ফলের গাছ আর ফুলের বাগান, তারই মাঝখানে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ি, দেখতে ছবির মত।

গাছের তলায় কতকগুলো মুরগি ঘুরছে, হাঁস চরছে, আর পায়রা উড়ছে।

ফুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে পথ, দু'দিকে বড় বড় ফুল ফুটে রয়েছে, কত রকমের, কত রঙের, কত সুন্দর সুন্দর ফুল, তাদের নাম জানি না।

নজরুল বললে, বাঃ, এখানে এই রকম জায়গা আছে, আগে বলনি! রোজ আসব এবার থেকে।

বললাম, ইংরেজিতে বল, এখানে বাংলা নয়।

নজরুল বললে, চুপ! গ্রামার একদম পড়িনি, সব ভুল হয়ে যাবে।

বললাম, হোক ভুল, তবু বলব।

নজরুল বললে, অমন কাজটি করো না। হেসে ফেলব।

কুকুরটা বোধ হয় এতক্ষণ আমাদের দেখতে পায়নি। এইবার হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, বাঘের বাচ্চা যেন।

কুকুরটাকে নজরুলও এতক্ষণ দেখেনি। যেই দেখা, উল্টে পড়ে আমাকে টানতে টানতে ছুটে একেবারে গেটের বাইরে। দে ছুট, দে ছুট।

ওদিকে সাহেব তখন চেঁচাচ্ছে: এসো, এসো তোমরা। টম কিচ্ছু করবে না। চলে এসো, নির্ভয়ে এসো।

নজরুল বললে, ওটা কুকুর কে বললে? ওটা তো বাঘ।

বললাম, না, বাঘের মত দেখতে। অ্যালসেশিয়ান।

নজরুল বললে, যাই হোক, বৈষ্ণব তো নয়। চল পালাই।

জায়গাটা ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না, কুকুরের ভয়ে ঢুকবারও সাহস নেই।

এমন সময় ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল গেটের কাছে। বললে, বাবা তোমাদের ডাকছে, এসো।

বললাম, কুকুরটা কামড়াবে না?

মেয়েটি বললে, ধেৎ, কাউকে কামড়ায় না। খুব কথা শোনে। চলে এসো তোমরা।

মেয়েটির পিছু পিছু দু'জনেই যাচ্ছি। নজরুল চুপি চুপি বললে, এরা সাহেব নয়, অন্য কোনও জাত।

—কে বললে?

—মেয়েটা কি রকম বাংলা বললে শুনলে না?

বললাম, বাংলা দেশে আছে আর বাংলা শিখবে না!

নজরুল বললে, তাহলে ইংরেজি ভুলে গেছে।

ধীরে ধীরে এসে বসলাম সাহেবের কাছে। সাহেব আগেই তার ইজিচেয়ারের দু'দিকে দুটি টুল পেতে রেখেছিল। কুকুরটা তখন শুয়ে শুয়ে মিট্ মিট্ করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

সাহেব বললে, পয়সা এনেছ?

বললাম, ইয়েস্, টেক ইট।

পকেট থেকে দু' আনা পয়সা বের করে তার হাতে দিলাম। তারপর বললাম, প্লিজ, স্পিক ইন ইংলিশ।

হোযাই?—সাহেব হো হো করে হেসে উঠল। তারপর ডাকতে লাগল, মতি! মতি!

যে মেয়েটি আমাদের এখানে ডেকে আনলে তারই নাম মতি।

মতি এসে দাড়াতেই সাহেব বললে ভাল একটি পাকা পেঁপে কেটে দুটি জায়গায় ভাগ করে এদের দু'জনকে দাও।

মতি বললে, মাকে বলবো, না আমি দেবো বাবা?

সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, মা তোমার কি করছে?

মতি তার বাবার কানে কানে কি বললে কিছুই বোঝা গেল না।

সাহেব হঠাৎ চীৎকার করে উঠল: শালা আবার এসেছে? আবার এসেছে শালা চোর!

এই বলে লাঠি হাতে নিয়ে সাহেব ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। যাবার সময় আমার-দেওয়া দু'-আনিটি কিন্তু সাহেব নিয়ে যেতে ভুললো না।

হঠাৎ বাড়ির ভেতরে দারুণ এক হট্টগোল।

মনে হলো সাহেব তার লাঠি দিয়ে কাকে যেন মারছে, আর সে লোকটা বাবারে মারে বলে চীৎকার করছে। এক মুহূর্ত দেরী না করে মতিও চলে গেল ভেতরে।

নজরুল বললে, এ কি আরম্ভ হলো? চল পালাই।

বললাম, পেঁপে খাবে না?

নজরুল বললে, মার খেতে হবে তাহলে।

চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় সাহেবের তাড়া খেয়ে চীৎকার করতে করতে যে-ছেলেটা আমাদের পায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তাকে আমরা দেখেই চিনতে পারলাম। দুগ্‌গা।

শুধু আমরা কেন, সারা রাণীগঞ্জের ভেতরে দুগ্‌গাকে চেনে না—এমন লোক বোধ হয় একটিও নেই। অস্বাভাবিক রকম লম্বা আর কালো, অস্থিচর্ম্মসার এই দুগ্‌গার বয়স বোধ করি কুড়ি কি বাইশ। টিয়া পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা আর লম্বা নাক, গোল-গোল বড়-বড় দুটো চোখ—একবার যে দেখেছে, সে আর ভুলবে না কখনও।

আগেও যেমন দেখেছি সেদিনও তেমনি দেখলাম তার পরণে খাঁকি হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে লাল রঙের গেঞ্জি।

মার খেয়ে ছুটে সে পালাচ্ছিল। টুলে পা লেগে উলটে পড়ে গেল। সাহেবের হাতের লাঠি তোলাই ছিল, নজরুল লাফিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে সাহেবের হাতখানা ধরে ফেললে।

সাহেব বললে, ছাড়, ওকে আমি আজ মেরেই ফেলব।

কালো রঙের বর্ষীয়সী যে-মেয়েটি সাহেবের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বলে উঠল, হ্যাঁ! তা আর মারবে না! এই ছেলেটাকে মারতে তোমার হাত উঠছে? ছিঃ!

সাহেব চেঁচিয়ে উঠল: ব্যাটা জোচ্চোর আমার ঘড়ি চুরি করেছে আর তুমি ওকেই কিনা বসে বসে-খাওয়াচ্ছিলে!

মেয়েটি বললে, বেচারা তিনদিন কিছু খায়নি। এই কথা শুনেও আমি চুপ করে থাকব ?

এই অবসরে দুগ্‌গা ছুটে পালিয়েছে দেখে নজরুল শেকার-সাহেবের হাতটা দিলে ছেড়ে। আর মতি বললে, মা, তুমি চুপ কর। যার জন্যে চেঁচাচ্ছ সে পালিয়ে গেছে।

মতির মা বললে, আহা, বেচারাকে খেতেও দিলে না গ !

শেকার-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম ঘড়ি আপনার ?

সাহেব বললে, খুব ভাল পকেট-ঘড়ি।

আমাদের বাড়ির সামনেই ঘড়ি মেরামত করবার একটি দোকান। বাঙালী ক্রিশ্চান জোসেফ্ তার মালিক। দুগ্‌গাকে আমি প্রায়ই দেখি, জোসেফের কাছে বসে বিড়ি টানছে। বললাম, আমি দেখব যদি ঘড়িটা উদ্ধার করতে পারি।

সাহেব বললে, দু' এক টাকা লাগে যদি—

মতির মা বললে, আমি দেবো। আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।

সেদিন আমাদের পেঁপেও খাওয়া হলো না, ইংরেজিও বলা হলো না। আর-একদিন আসবো বলে চলে এলাম।

জোসেফ মানুষটি বড় ভাল। সেদিনই সন্ধ্যায় তার দোকানে গিয়ে বসলাম। এক ফাঁকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, দুগ্‌গা আপনাকে একটা ঘড়ি দিয়েছে ?

জোসেফ আমার মুখের পানে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। খানিক পরে বললে, তোমাদের ঘড়ি ? দেড়টি টাকা নিয়ে এসো। আমি দোকান বন্ধ করব।

তৎক্ষণাৎ ছুটলাম শেকার-সাহেবের বাড়ি।

কুকুরের ভয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মতি মতি বলে ডাকছি। দূর থেকে মতি বললে, বাবা বাড়িতে নেই।

বললাম, তোমার মাকে ডাক। শিগ্‌গীর।

সেই কালো মেয়েটি বেরিয়ে এলো। বললাম, দেড়টা টাকা দিন, ঘড়িটা এনে দিচ্ছি।

হাসতে হাসতে মতির মা একটি টাকা আর একটি আধুলি আমার হাতে এনে দিল। বললে, বেঁচে থাকো বাবা, তুমি আমার কী উপকার যে করলে!

—দাঁড়ান আগে এনে দিই, তারপর বলবেন।

টাকাটা জোসেফের হাতে দিতেই জোসেফ আমার হাতে ঘড়িটা দিয়ে বললে, দুগ্গাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিও না। ওটা আস্ত চোর।

কথার জবাব না দিয়ে ঘড়ি নিয়ে আমি ছুটলাম শেকার-সাহেবের বাড়ি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে কুকুরের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়ে দেখি দোরের সামনে কুকুরটা শুয়ে আছে। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল চকিতে। থমকে থেমে গিয়ে চীৎকার করে ডাকলাম, মতি। কুকুর—

কুকুরটা কিন্তু চোখ তুলে আমাকে দেখেই মুখ নামিয়ে নিলে। কিছুই বললে না। মতি এলো। মতির মা এলো। মতি আমার অবস্থা দেখে হেসেই খুন। হাসতে হাসতে বলে, চেনা মানুষকে টম কিছু বলে না।

মতির মার হাতে ঘড়িটা দিতেই তার সে কি আনন্দ?

আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না! বলে, কিছু খেয়ে যাও।

আমার কিন্তু তখন আর এক মুহূর্ত দেরি করবার উপায় নেই। পড়ার জায়গায় আমাকে না দেখলেই লোক ছুটবে নজরুলের বোর্ডিং-এ। বললাম, আর-একদিন আসব। বলেই ছুটে পালিয়ে এলাম।

তারপর থেকে প্রায়ই যেতাম সাহেবের বাড়ি। কিন্তু যে-কাজের জন্যে যাওয়া সে-কাজ আর হয়ে উঠতো না। শেকার-সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া শুনতাম মতির মার। শেকার-সাহেব রাগলে সবাইকে শালা

বলত। মতির মাকেও বলতো—শালা। নজরুল আর আমি হো হো করে হেসে উঠতাম। আচ্ছা লোক তো!

শেকার-সাহেব পয়সা পয়সা করেই অস্থির। আর মতির মা সেদিক দিয়ে দিলদরিয়া। চারটি পয়সা হাতে নিয়ে আমাদের দু জনকে দুটি পেয়ারা দিলে শেকার-সাহেব। ভাবলে খুব বিজনেস করলাম। ওদিকে সাহেবের চোখের আড়ালে দুটো দুটো চারটে ডিমের আমলেট তৈরি করে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের খাইয়ে দিলে মতির মা।

অত বড় একটা সাহেব, সাদা ধপ ধপ করছে গায়ের রং, আমরা কথা বলি রীতিমত সমীহ করে, অথচ মতির মা—নেহাৎ কুৎসিত না হলেও কয়লার মতন গায়ের রং, কি জাতের মেয়ে তাই-বা কে জানে, সাহেবকে থোড়াই কেয়ার করে। সে এতটুকু খাতির করে কথা বলে না।

নজরুল একদিন বললে, কই হে, তোমার সাহেব তো ইংরেজিতে কথাই বলছে না। হয়তো ভুলেই মেরেছে।

মতির মা হাসতে হাসতে বলেছিল, নাই-বা বললে। ইংরেজিতে কথা বললে তোমরা বুঝতে পারবে না যে!

নজরুল বললে, শুনতে শুনতে বুঝব! পরে আমরাও বলব।

আমি সেদিন মতির মাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম, ইংরেজিতে কথা বলা আমরা শিখতে চাই। সাহেব বলবে, আমরাও বলব, এমনি বলতে বলতেই একদিন শিখে ফেলব।

কথাটা শুনে মতির মা'র আর হাসি থামে না। বলে, খবরদার, খবরদার, অমন কাজটি করো না। সাহেব তোমাদের ভুল শিখিয়ে দেবে।

সাহেব কোথায় যেন গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়েই লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে এসে দাঁড়াল। মতির মা তার মুখের ওপরেই বলে দিলে, সাহেব লেখাপড়া জানে না যে! মুখ্যু! গো-মুখ্যু।

মেলা টাকাই জমিয়েছে শুধু, নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে কলম ভাঙে।

সাহেব তার ইজিচেয়ারটিতে আরাম করে বসতে বসতে বললে, শালা!

সময় পেলেই আমরা ছুটতাম শেকার-সাহেবের বাংলোয়।

ইংরেজি শেখা হলো না। তবুও যেতাম। গেলেই দু-চার পয়সা প্রণামী দিতে হতো সাহেবকে, তবু যেতাম। সেখানে যাবার কেমন যেন একটা অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করতাম। অপরিণত বয়স্ক ইস্কুলের ছাত্র, কোন-কিছুই তলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা তখন আমাদের ছিল না। এখন এতদিন পরে এই বৃদ্ধ বয়সে বিগত জীবনের পেছনের পাতাগুলো ওল্টাতে গিয়ে দেখি, এইখানকার কয়েকটি পাতায় যেন কেমন পাকা রং ধরেছে। এতদিন পরে সবকিছু ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। রাণীগঞ্জে গিয়ে দেখে এসেছি—শেকার-সাহেবের সে বাংলো নেই, মনোরম তপোবনের মত স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন সেই আশ্রমটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শেকার-সাহেব নেই, মতির মাও নেই, টম কুকুরটিও নেই। শুনেছিলাম এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে মতি চলে গেছে সিঙ্গাপুরে। মহাকাল সব শেষ করে দিয়েছে। কালো কুৎসিত মতির মা শুধু আমার জীবন-খাতার কয়েকটি পাতা আলো করে রেখেছে। হয়তো-বা সে ছিল অস্পৃশ্যা, হয়তো-বা কোন অচ্ছুতের মেয়ে, সমাজে হয়তো-বা তার কোনও স্থান ছিল না, কিন্তু আমার মনের মণিকোঠায় মহীয়সী জননীরূপে এখনও সে তার পবিত্র স্থানটুকু অধিকার করে রয়েছে।

নজরুল ছিল একটু অশান্ত চঞ্চল, কিন্তু মতির মা'র কাছে এলেই সব চঞ্চলতা তার স্থির হয়ে যেতো। চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবতো, একটি কথাও বলতো না।

দুগ্‌গা !

শেকার-সাহেবের বাংলোয় যত অপাস্তি উপদ্রব ছিল এই দুগ্‌গাকে নিয়ে। শেকার-সাহেব কিছুতেই তাকে সহ্য করতে পারতো না।

আর কেই-বা পারতো !

ক্যাঁকলাসের মত ওই লম্বা ডিগ্‌ডিগে ছেলেটা সারা রাণীগঞ্জের লোককে জ্বালিয়ে খেয়েছিল। পথের কুকুরগুলো যেমন ঘুরে বেড়ায় দুগ্‌গাও ঠিক তেমনি করে ঘুরত শহরের পথে পথে। কখনও কারও বাড়ির রকে, রেল-ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে, প্লাটফর্মের ধারে মাঠের কিনারায়, থানার বারান্দায়, শান-বাঁধানো ঘাটের চত্বরে, আস্তাবলের পাশে, কিংবা নির্জন কবরস্থানের গাছের তলায় বসে ঘুমিয়ে রাত কাটাতো।

কেমন করে তার দিন চলত, কি খেত, কেউ তার কোনও খবর রাখত না। শুধু খবর রাখত তখন—যখন কারও কোনও জিনিষ চুরি যেত। তখন সবাই দুগ্‌গা নামের মত দুগ্‌গাকে স্মরণ করত।

যেই চুরি করুক, সবাই বলত দুগ্‌গা করেছে। যেখানে পেত কানে ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনত, তারপর চলত তার শরীরের সেই হাড় ক'খানার ওপর অত্যাচার। নির্মম আর অমানুষিক। কিন্তু আশ্চর্য, এত যে মার খেত, কোনদিন তার চোখে আমি জল দেখিনি। বাবারে, মারে বলে চীৎকার করত শুধু, কাঁদত না।

আর এত মারও সে খেতে পারত !

এই দেখেছি থানার কোনও কন্‌ষ্টেবল তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, আবার খানিক পরেই দেখতাম, পান খেয়ে বিড়ি টানতে টানতে হাসতে হাসতে সে পথ চলছে ! যেন কত সুখী !

কোথাও যখন কিছু জুটত না, ক্ষিদের জ্বালা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, তখনই বোধ হয় ঐ বাড়িটা তাকে আকর্ষণ করত। সে চুপি চুপি গিয়ে হাজির হতো শেকার-সাহেবের বাংলোয়।

তার ওপর মতির মা'র ছিল অপরিসীম করুণা।

কিন্তু সেখানেও ছিল এক বিড়ম্বনা।

শেকার-সাহেবের নজরে যেদিন পড়ত, সেদিন আর তার খাওয়া হতো না, খেয়ে পালাবার পথ পেত না।

ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনটাকে এমনি করেই টেনে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল দুগ্‌গা। হঠাৎ তার জীবনে এলো এক পরিবর্তন।

আরও বছর-দেড়েক পরে।

ইওরোপে তখন বেজে উঠেছে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা।

নজরুল আর আমি—দু'জনেই ফার্স্ট ক্লাশে পড়ছি। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা চলছে। কিছুদিন ধরেই দেখছি শহরের অলিতে গলিতে, প্রতিটি বাড়ীর দেয়ালে, গাছের গুড়িতে নানা রঙের রকমারি পোষ্টার মারা হচ্ছে। মহামান্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত-বর্ষের যুবশক্তিকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে মহা শক্তিশালী এক যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করতে চান! অঢেল করুণা তাঁদের! এ সুবর্ণ সুযোগ হারানো উচিত নয়।

নজরুল আর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নাম লেখালাম বাঙালী পল্টনে। কেন লেখালাম, কেনই-বা এ-কাজ করলাম সে-সব অনেক কথা। পরে বলব।

নির্দেশ মত প্রথমে আমাদের যেতে হবে কলকাতায়। সেখান থেকে করাচী।

সবাই ধরে বসল—দুগ্‌গাকে নিয়ে যাও। পাড়া জুড়োক।

যুদ্ধে যাওয়া মানে মৃত্যু বরণ করা। এই ছিল তখনকার ধারণা। ইস্কুলের ছেলে, পড়াশোনায় সুনাম আছে, সবাই ভালবাসে, কি এমন হলো আমাদের, যার জন্য এই দুর্মতি—এরই জবাব দিতে দিতে প্রাণান্ত হয়ে গেলাম। যে ক'দিন রাণীগঞ্জে রইলাম, লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুগ্‌গা কিন্তু মুহূর্তও সঙ্গ ছাড়ল না।

কত বুঝালাম! কত বললাম। তোর এই হাড়-জিরজিরে

চেহারা, তোকে নেবে কেন যুদ্ধে? কি করবি তুই?

দুগ্‌গা বলে, কত কাজ আছে সেখানে! চাকর চাই, রাঁধুনি চাই, সবাই তো আর বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ করবে না!

দুগ্‌গা বসে বসে আমাদের পা টিপতে লাগল।

তার জেদ দেখে আমরা আর না বলতে পারলাম না! বললাম, চল্ তা'হলে।

রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে রাত্রি বারোটার পর ট্রেন। প্রচণ্ড শীত।

নজরুল আর আমি হাওড়ার টিকিট কেটে ট্রেনের কামরায় উঠলাম। দেখি, দুগ্‌গা তার আগেই এসেছে। হাসতে হাসতে বিড়ি টানছে। পরণে সেই হাফ-প্যাণ্ট, সেই লাল গেঞ্জি আর খবরের কাগজে জড়ানো কি-একটা জিনিস! জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে, তোর শীত করছে না?

খবরের কাগজের মোড়কটা দেখিয়ে দুগ্‌গা হাসতে হাসতে বললে, এই ছাখ্।

দেখলাম, উলের একটি দামী সোয়েটার!

—এ তুই কোথায় পেলি?

নজরুল বললে, কারও দোকান থেকে মৃগয়া করেছে হয়তো।

—কি রে, কোথায় পেলি বল্ না?

দুগ্‌গা কোনও কথা বলে না, শুধু দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

—কেউ দিয়েছে?

মাথাটা একটু কাত্ করে বললে, হ্যাঁ।

—কে দিয়েছে?

আর কথা নেই। আবার চুপ!

হঠাৎ মতির মা'র কথাটা আমার মনে পড়ল। বললাম, মতির মা দিয়েছে?

দুগ্‌গা বললে, হ্যাঁ। বলেই সে ট্রেনের জানালার ধারে গিয়ে বসে পড়ল।

ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। দেখলাম, সে জানালার বাইরে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরাও তাকালাম। দেখলাম, সেই দুরন্ত শীতের রাত্রে প্ল্যাটফর্মের কিনারায় একটা ক্ষীণ আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে মতির মা।

আমরাও ঝুঁকে পড়লাম জানালার পথে। হাত নেড়ে মতির মাকে জানালাম, আমরা চলে যাচ্ছি।

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে চলে এলো। আর দেখতে পেলাম না।

—ছি ছি, মতির মা এসেছে, আগে বলতে হয়!

নজরুল জিজ্ঞাসা করলে, হাঁরে দুগ্‌গা, মতির মা তোকে এত ভালবাসে, ও কি তোর কেউ হয়?

দুগ্‌গা তার সেই বড় বড় চোখ দুটি তুলে একবার নজরুলের আর একবার আমার মুখের দিকে তাকালে, তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমার মা।

অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

নজরুল শুধাল, মতি তোর বোন?

দুগ্‌গা বললে, হ্যাঁ। সায়েবের মেয়ে।

বললাম, কই এ-কথা তো আগে বলিসনি?

দুগ্‌গার গলাটা ধরে এলো এবার। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বারণ ছিল।

যা আমরা কোনদিন দেখিনি, সেদিন তাই দেখলাম। দেখলাম, দুগ্‌গার দু' চোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে।

তিন:

কড়িকাঠের ফাঁকে বাসা বেঁধেছিল একটি চড়ুই পাখি। তারই একটি ছোট্ট বাচ্চা একদিন উড়তে গিয়ে পড়ে গেল নীচেয়।

আহা, বেচারা! উড়ে পালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না, খানিকটা গিয়েই আবার বসে পড়ল। সবে তখন সে উড়তে শিখছে।

আমরা—যে ক'জন ছিলাম সেখানে, তখন কতই-বা আমাদের বয়স! আমরাও তখন ছোট।

যে-পাখি ধরা দেয় না, ধরতে গেলে উড়ে পালায়, সেই পাখি নিজে এসে ধরা দিয়েছে। আনন্দ আর ধরে না আমাদের।

আমাদেরই ভিতর একজন ছুটে গিয়ে পাখিটাকে ধরে ফেললে। একজন আনলে লম্বা খানিকটা লাল সুতো। বাঁধা হলো পাখিটার পায়ে।

তারপর চলতে লাগল খেলা।

পাখিটা চেষ্টা করছে উড়ে পালাবার। বেশি দূর যেতে পারছে না। পায়ে টান পড়তেই বসে পড়ছে। আবার পালাবার চেষ্টা।

ওদিকে মাথার উপরে পাখিদের জগতে তখন হুলুস্থূল পড়ে গেছে। মা-পাখিটা চীৎকার করছে। উড়ে উড়ে একবার এখানে বসছে, একবার ওখানে বসছে। ভাষা বুঝি না, তবু মনে হচ্ছে—কি যেন সে বলছে আমাদের। আরও অনেকগুলো চড়ুই পাখি জুটেছে তার সঙ্গে। মা-পাখির অনুকরণে সবাই যেন আমাদের কি বোঝাবার চেষ্টা করছে।

নজরুল বললে, ওকে ছেড়ে দাও।

—হ্যাঁ ছেড়ে দিই, আর কাগে ঠুকরে ঠুকরে ওকে মেরে ফেলুক।

কে যেন বললে, ওকে ওইখানে তুলে দাও!

—বেশ বলেছ! তুলে দিই, আবার পড়ে যাক। এবাব পড়লে ও মরে যাবে।

তাছাড়া কড়িকাঠ অনেক উঁচুতে। নাগাল পাওয়া মুশকিল।

নজরুল কখন বেরিয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। খানিক পরে দেখি, সে একটা মই কাঁধে নিয়ে ফিরে আসছে।

পাখিটা তখন আর উড়ছে না। এক জায়গায় বসে থর থর করে কাঁপছে। ভয়ে বোধ হয় আধমরা হয়ে গেছে।

সেই আধমরা পাখির বাচ্চাটিকে তুলে দেওয়া হলো তাব মায়ের কাছে। নজরুলই তুলে দিলে। মইয়ে চড়ে।

ভাল কাজের একটা মজা আছে। যখন কেউ করে না তো করে না, আবার যখন কেউ করে, তখন মানুষেব মাথা সেখানে আপনা থেকেই হেঁট হয়ে যায়।

আমার খুব ভাল লাগল। মনের মধ্যে কেমন একটা আলোড়ন অনুভব করলাম। সেইদিনই রাত্রে আমি একটি কবিতা লিখে ফেললাম।

নজরুলকে শোনাতে গিয়ে দেখি, সে-ও লিখেছে একটা। কবিতা নয়, লিখেছে কথিকা। আজকালকার দিন হলে হয়ত বলতাম গদ্য কবিতা।

বাগানের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আছি আমরা দু'জনে। আমি বলছি—তার লেখাটা ভাল হয়েছে, সে বলছে আমারটা।

মীমাংসা আর কিছুতেই হচ্ছে না, হঠাৎ পঞ্চু এসে মীমাংসা করে দিলে। কখন যে সে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। তার গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। কিন্তু পরেই তার মন্তব্য কানে এল,—কোনটাই কিছু হয়নি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি শুনেছ?

পঞ্চু বললে, শুনেছি। ভারি তো একটা চড়ুই পাখি! আমাদের দর-দালানে ওরকম হাজার-হু'হাজার আছে।

পঞ্চুর এইরকম বুদ্ধি চিরকাল। এক ক্লাশেই পড়তাম, পর পর হু'বছর প্রমোশন পায়নি। এখন সে আমাদের হু'ক্লাশ নীচে।

সেজন্য তার হুঃখ নেই। আফশোস নেই। তার হুঃখ শুধু হুটি পায়ের জন্যে। পা হুটি তার জন্মাবধি বাঁকা। ধনুকের মত বাঁকা। সেই পা হুটি ঢাকা দেবার জন্যে তার চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

ঢিলে পাৎলুন তৈরি করিয়েছে, ট্রাউজার পরেছে, কখনও-বা পাৎলুনের ওপর পা পর্যন্ত আলখেল্লা চড়িয়েছে, কতরকমের কত কিম্ভূতকিমাকার পোশাকে পা হুটি ঢাকবার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু সবই নিষ্ফল।

লোকজন সব হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছে কেউ-বা হেসেছে। কেউ-বা ডেকে জিজ্ঞাসা করেছে। ওরকম পোশাক কেন হে?

পঞ্চু জবাব দেয়নি।

—লাটসাহেবের মেজাজ ছাখো!

সেই থেকে ও অঞ্চলে তার নামই হয়ে গেছে—পঞ্চু-লাট।

অনেকে তাকে পঞ্চু-লাট বলে ডাকে। পঞ্চু গ্রাহ্যই করে না। হয় জবাব দেয় না, নয়তো দেয়, কখনো বা হাসে।

আমরা অবশ্য তাকে পঞ্চু বলেই ডাকি। আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধই আলাদা।

বড়লোক জ্যেঠামশাই-এর পোষ্যপুত্র। ইস্কুলের পড়া পড়ে না, কিন্তু পাব্লিক-লাইব্রেরীর নভেলগুলো সব প্রায় শেষ করে ফেলেছে সে। প্রতি মাসে দেখি কলকাতা থেকে দীনেন রায়ের ডিটেক্‌টিভ বই-এর ভি-পি আসছে তার নামে।

পঞ্চু সেদিন বাগান থেকে আমাদের নিয়ে গেল তার বাড়িতে। কাছেই বাড়ি। দোতালা বাড়ির দক্ষিণদিকের একখানি

বড় ঘরে সে থাকে। ঘরখানি নিজের মনের মত করে সাজিয়েছে।

দেয়ালে পঞ্চম জর্জ, সপ্তম এডওয়ার্ড থেকে আরম্ভ করে তখনকার দিনের কয়েকজন হোমরা-চোমরা লাট-বেলাটের ছবি টাঙানো। মেঝেয় কার্পেট পাতা, তার উপর কয়েকটি চেয়ার।

ঘরে ঢুকতেই আমাদের বসিয়ে পঞ্চু চেঁচিয়ে বললে, তিন পেয়ালা চা।

বলেই সে নিজের গদি-আঁটা চেয়ারটিতে গিয়ে বসল। সুমুখে অনেকগুলি ড্রয়ার-দেওয়া একটি টেবিল। টেবিলের উপর এক গাদা ডিটেকটিভ নভেল।

ড্রয়ার থেকে বিলেতি কোম্পানীর রঙীন বিস্কুটের টিন বের করে পঞ্চু বললে, নাও, খাও!

নজরুল বললে, তার আগে তুমি সেই জিনিসটা কবে আনাচ্ছ তাই বল।

জবাব না দিয়ে পঞ্চু বললে, তার আগে আমাব একটা জিনিস আসছে, সেইটে আসুক, তারপর—।

কিছুই বুঝলাম না। নজরুলই-বা কি বলছে, পঞ্চুই-বা কি বলছে। বুঝতে না পেরে আমি ঘন ঘন এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম।

—কি জিনিস?

নজরুল বলতে চায় না। ফিক্ ফিক্ করে হাসে কেবল।

পঞ্চু বলে, কাল চল আমার সঙ্গে পোস্টাপিসে। নিজের চোখেই দেখে আসবে।

কলকাতা থেকে ভি-পি পার্সেলে জিনিসপত্র আনানো—জানি পঞ্চুর এ একটা শখ। পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে দেখে কত বিচিত্র রকম জিনিস যে সে আনিয়েছে!

আমার দাদামশাই-এর নামে দুটো বড় বড় ইংবেজি ক্যাটালগ

এসেছিল কলকাতা থেকে। একটার উপরে লেখা, 'হোয়াইটওয়ে লেড্‌লো', আর-একটার ওপর 'আর্মিনেভি স্টোর্স'। বই দুটো পড়েই থাকতো ঘরের এক কোণে, কেউ কোনদিন উল্টেও দেখতো না। আমি একদিন দেখতে গিয়ে আর ছাড়তে পারলাম না। চকচকে পুরু আর্ট পেপারে ছাপা, পাতায় পাতায় রং-বেরঙের কত ছবি। ছবি দেখবার জন্যে নিয়ে এলাম বই দুটো।

সেই ক্যাটালগ্ দুটি আমি দিয়েছি পঞ্চুকে।

বলেছি, এই নাও, এবার থেকে সায়েবদের দোকানের জিনিসপত্র আনাও।

বই দুটো পেয়ে পঞ্চুর যে সে কী আনন্দ!

সেই দিনই সে তার পঞ্জিকাটা দূরে সরিয়ে রেখে বললে, বাঃ, এই তো আমি চাইছিলাম এতদিন।

ওই-সব সাহেবদের দোকানে পঞ্চু-লাটের কিছু অর্ডার গেছে কিনা তাই-বা কে জানে!

পরের দিন ইস্কুলের ছুটির পর যেই পথে বেরিয়েছি, পঞ্চু হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। বললে, চল।

বাড়ি যেতে হলে একই রাস্তায় যেতে হবে দু'জনকে। এক রাস্তা ধরেই যাচ্ছি, জিজ্ঞাসা করলাম, নজরুল কি আনতে বলেছে বললে না তো?

তখনও কিছু বললে না। কেবল মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

পথের ধারেই পোস্টাপিস। পঞ্চু বললে, এস, এসেছে কিনা খোঁজ নিয়ে যাই।

পোস্টাপিসে যেতেই আমাদের পাড়ার বুড়ো পিওন পঞ্চুকে দেখে এগিয়ে এলো। বললে, বাবু পার্সেল এসেছে। ছাব্বিশ টাকা ন' আনা।

পঞ্চু তখন পকেটে হাত দিয়েছে।

পিওন বললে, নিয়ে যেতে পারবেন ? মস্ত বড় বাক্স।

—তা হোক, নিয়ে এস জলদি।

যেন আর তর সয় না।

পঞ্চু তার পকেট থেকে টাকা বের করে গুণে গুণে সাতাশটা টাকা তার হাতে দিয়ে বললে, খুচরো সাত আনা আর ফেরত দিতে হবে না। তোমার বখশিস।

পোস্টাপিসের ভিতর থেকে পিওন লম্বা একটা কেরোসিন-কাঠের বাক্স নিয়ে এল। পঞ্চুর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি এটা ?

সগর্বে পঞ্চু বললে, বন্দুক।

বাক্সটা চট দিয়ে মোড়া। তার ওপর কাগজের সুন্দর লেবেল। বড় বড় ইংরেজিতে লেখা হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল এণ্ড কোং।

—আমার দেওয়া ক্যাটালগের সদ্ব্যবহার করেছ তাহলে ?

পঞ্চু বললে, যার নামে এসেছে পার্সেলটা, আগে তার নামটা পড়ে ত্যাখো !

পড়তে গিয়ে হেসে ফেললাম। লেখা আছে—রায়বাহাদুর পঞ্চানন ঘোষ।

—এ আবার কি রকম পাগলামি ?

পঞ্চানন বললে, পাগলামি নয়। রায়বাহাদুর না লিখলে এইরকম খাতির করে পাঠাত ভেবেছ ? অর্ধেক টাকা অগ্রিম মনিঅর্ডার করে পাঠাতে লিখতো। এইবার আমার নামে ওর হরদম ক্যাটালগ্‌ পাঠাবে দেখো।

বললাম, পার্সেলটা খোলো, দেখি কেমন বন্দুক।

পঞ্চু বললে, না। নজরুলকে ডাকব, ডেকে ওর সামনেই খুলব।

এতক্ষণে বুঝলাম, বন্দুকের শখটা কার।

আমাদের হাতে বইখাতা। অত বড় কাঠের বাক্সটা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। পঞ্চু একটা কুলি ডাকলে।

রাস্তায় যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, বন্দুকের লাইসেন্স করতে হবে না?

পঞ্চু কানে-কানে বললে, চুপ। এয়ারগান।

বরকত্ আলীর ছেলেকে একদিন এয়ারগান দিয়ে পাখি মারতে দেখেছিলাম। তাকে লাইসেন্সের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছিল, বছরে চার আনা।

—এটাও তো সেই এয়ারগান?

পঞ্চু বললে, না, সেটা এর চেয়ে ভাল। এটা তার কাছাকাছি।

নজরুলকে ডাকতে হলো না। সে নিজেই এলো। পার্সেলের ওপর পঞ্চুর নামের আগে রায়বাহাদুর দেখে খুব একচোট হেসে বললে, আমাদের পাঁচু আবার রায়বাহাদুর হ'ল কবে? তারপর চললো পার্সেল খোলার পালা। ছুরি এলো, কাটারি এলো, সাঁড়াশি এলো। ছুরি দিয়ে চট্টা কাটছিল নজরুল, পঞ্চু হাঁ হাঁ করে নিষেধ করলে। রায়বাহাদুর-লেখা কাগজটা তার চাই। যত্ন করে রেখে দেবে। আরো কতজনকে দেখাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। সযত্নে পার্সেলটি খুলে চকচকে বন্দুকটি দেখে আমাদের আর আনন্দ ধরে না। বন্দুকের সঙ্গে ছিল কাগজের একটি বাক্সে এক হাজার ছোট ছোট গোল গোল ছর্‌রা গুলী।

কিন্তু মাঝ থেকে গোল বাধল একটা। কেমন করে বন্দুকে গুলী ভরতে হয়, কেমন করে ছুঁড়তে হয়—নজরুলও জানে না, পঞ্চুও জানে না। আমার শরণাপন্ন হতে হলো তাদের!

আমি যখন আরও ছোট, তখন আমার একটা ছোট এয়ারগান ছিল। কিন্তু গুলী ভরতে গিয়ে দেখি, এটা সেরকম নয়। না হলেও বুঝে নিতে দেরি হলো না।

ইস্কুল থেকে ফিরে অবধি পঞ্চু এখনও কিছু মুখে দেয়নি, জ্যেঠাইমা কতক্ষণ থেকে ডাকাডাকি করছেন। যতবার তিনি

ডাকছেন পঞ্চু ততবার চীৎকার করে তাঁকে ধমক দিচ্ছে।—'দেখতে পাচ্ছ না, কিরকম কাজে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি!'

এদিকে বেলা সরে আসছে। সন্ধ্যে নামতে বেশি দেরি নেই। শিকারে বেরুতে হলে আর এক মুহূর্ত দেরী করা যায় না। খাওয়া রইল পড়ে। পঞ্চুর সঙ্গে আমরাও সকলে বেরিয়ে পড়লাম।

পঞ্চু কিন্তু বন্দুকটা কাউকে ছুঁতে দেবে না।

এমন একটা ভঙ্গী করে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে সে এগিয়ে চললো —যেন কত বড় শিকারী।

আমরা যাচ্ছিলাম তার পিছু পিছু।

বন্দুকটা একবার কখন চালাতে দেবে এই লোভে এমনি করে তার পিছু-পিছু যাওয়াটা নজরুল কেমন যেন পছন্দ করছিল না। তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বললাম, পঞ্চু পাখি মারুক. চল আমরা চলে যাই।

চলে আমরা সত্যিই যাচ্ছিলাম, কিন্তু পঞ্চুই যেতে দিলে না। পিছন ফিরে দেখলে, আমরা অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছি। এই পিছিয়ে পড়ার কারণটাও বোধ করি সে অনুমান করেছিল। বললে, এসো দেখে যাও।

অর্থাৎ কেমন করে সে বন্দুক ছুঁড়ছে ছাখো। দেখে নয়ন সার্থক কর।—কেউ যদি নাই দেখলে তো এত টাকা খরচ করে বন্দুক সে আনলে কিসের জন্যে?

কাছে যেতেই পঞ্চু বললে, কি মারি বল?

যেন মারতে সে সবই পারে, শুধু আমাদের বলার অপেক্ষা! —

পাখিদের তখন ঘরে ফেরবার সময়। চারদিকে কাকলি - চোখের সামনে কত রকমের কত পাখি। বললাম, মারো না একটা!

পঞ্চু ফুটফাট করে বারকতক চালালে বন্দুকটা। কিন্তু পাখি মরা দূরে থাক, কেউ একটু নড়েও বসল না।

বললাম, পাখি ওতে মরে না।

পঞ্চু বললে, নিশ্চয় মরে। দু'একদিন প্র্যাক্‌টিস করলেই ঠিক মারতে পারব।

—না, মরবে না। সে বন্দুকের দাম বেশি।

পঞ্চু বললে, সেই দামী বন্দুকটাই ওরা আমাকে পাঠিয়েছে।

—কেন?

পঞ্চু বললে, আমি যে রায়বাহাদুর! ওরা আমাকে খাতির করেছে।

এই বলে সে নিজেও হাসতে লাগল। আমরাও সরবে হেসে উঠলাম।

পঞ্চুর তখন জেদ চেপে গেছে। প্রাণপণে একটার পর একটা এলোপাথাড়ি গুলী চালাতে লাগল। যতক্ষণ না তার হাত ভেরে গেল ততক্ষণ চললো এই অব্যর্থ সন্ধান।

আমাদেরও আসতে দিলে না, বন্দুকটাও হাতছাড়া করলে না।

বন্দুক চালাবার সাধ এমন সময় তার মিটল যখন কোনদিকেই আর ভাল নজর চলে না। চারিদিকে নেমে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার।

নজরুলের দিকে এতক্ষণে বন্দুকটা বাড়িয়ে ধরে পঞ্চু বললে, নাও —এবার চালাও!

নজরুল নিলে না বন্দুকটা। বললে, এখন আর নজর চলবে না থাক।

পঞ্চু বললে, তাহলে কাল চালাবে। আজ রেখে দিইগে।

পঞ্চু বন্দুক রাখতে গেল, আমরাও চলে এলাম সেখান থেকে। নজরুলের মুখখানা গম্ভীর। হাসছে না, কথা বলছে না। মনে হচ্ছে যেন খুব ইচ্ছে ছিল বন্দুক চালাবার। চালাতে না পেয়ে মনটা ভারি হয়ে উঠেছে।

পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম আমি—মাত্র পনেরো

টাকায় বাড়ি বসে বায়োস্কোপের ছবি দেখা যাবে। দেয়ালে পর্দা টাঙিয়ে মোমবাতি দিয়ে বায়োস্কোপের ছবি দেখা যায়। পঞ্চুকে আমি অনেকদিন থেকে সেই মেশিনটা আনাবার কথা বলেছিলাম। মাঝখান থেকে নজরুল দিলে সব মাটি করে! সায়েবদের দোকানের ক্যাটালগ এনে দিলাম, তাইতে বন্দুকের ছবি দেখে নজরুল তাকে বন্দুক আনাবার কথা বলতেই সে বন্দুক আনালে। তার চেয়ে যদি পনেরোটি টাকা খরচ করে সিনেমার মেশিনটা আনাতো, এতক্ষণ সবাই মিলে আমরা একসঙ্গে বসে বসে বায়োস্কোপের চলন্ত ছবি দেখতাম।

বললাম, তোমরাও যেমন! আনাবার মত আর কিছু জিনিস পেলে না! বন্দুক দিয়ে কি হবে?

নজরুল বললে, ইংরেজদের তাড়াতে হবে এদেশ থেকে।

—ইংরেজদের তাড়াতে হবে?

হেসেই ফেললাম কথাটা শুনে। বললাম—ইংরেজ তাড়াবে ওই এয়ারগান দিয়ে? বেশ বলেছ।

নজরুল বললে, ওই এয়ারগান দিয়ে হাতের নিশানাটা ঠিক করে নেবো ভেবেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই।

তার পরের দিনই দেখা গেল, বন্দুক চালাবার শখ পঞ্চুর মিটে এসেছে।

ইস্কুলের ছুটির পর যাচ্ছিলাম নজরুলের বোর্ডিং-এ, পথে পড়ল পঞ্চুর বাড়ি, ভাবলাম দেখেই যাই, কী করছে পঞ্চু।

দেখলাম, পঞ্চু বাড়িতে নেই। জ্যেঠাইমা বললেন, না বাবা আজ আর সে ইস্কুলে যায়নি। সারাদিন শুধু চড়ুই পাখি মেরেছে।

—মেরেছে? ক'টা? কই দেখি।

সখেদে জ্যেঠাইমা বললেন, মরেছে নাকি? মরেনি একটাও। আমিই শুধু—এই ছাখো, মরতে মরতে কোন রকমে বেঁচে গেছি।

এই বলে জ্যেঠাইমা তাঁর বাঁ-হাতটা দেখালেন আমাকে। দেখলাম কনুই-এর কাছে অনেকখানি জায়গায় চুন লাগিয়েছেন।

বললেন, ওইখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ফট্ করে এসে লাগল।

—খুব লেগেছে বলুন। কোথায় সে?

জ্যেঠাইমা বললেন, আমার বকুনি খেয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে কোথায় পালিয়েছে।

খবরটা নজরুলকে দেবার জন্যে তার বোর্ডিং-এ গিয়ে দেখি পঞ্চু নেই। নজরুলেব খাটের ওপর পঞ্চুব বন্দুকটা পড়ে রয়েছে।

আবদুল কুযোর কাছে বসে কাপড়ে সাবান দিচ্ছিল। বললে, দুখু মিঞা এখনও ইস্কুল থেকে ফেরেনি।

জিজ্ঞাসা ক·লাম, বন্দুকটা কে বেখে গেছে বে?

আবদুল বললে, পাঁচু-লাট।

—আব কিছু বলে গেছে?

আবদুল বললে, না, রেখে দিযে চলে গেল।

নজরুলের খাটেব পাশেই জানালা। কাঠের গরাদ-দেওয়া সেই জানালার ফাঁকে বন্দুকের নলটা বাগিয়ে ফটাস্ ফটাস্ কবে চালাচ্ছি, এমন সময় নজরুল এলো ইস্কুল থেকে। বন্দুকটা দেখেই ব‍ে উঠল, নিয়ে এসেছ বুঝি?

বললাম, না। পঞ্চু দিয়ে গেছে।

নজকল বললে, বুঝতে পেরেছে বোধ হয়, আমি রাগ কবেছি:

বললাম, না। তুমি রাগ কবলে তো ওর বয়েই গেল।

তাহলে দিয়ে গেল কেন?

বললাম, দু'দিনেই ওর শখ মিটে গেছে।

বইখাতা রাখতে না রাখতে নজরুল বললে, চল।

—কিছু খাবে না?

—না, দেরি হয়ে যাবে।

বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। গেলাম নির্জন কবরখানায়।

শহরের একটেরে ক্রিশ্চানদের কবরখানা। ওর ত্রিসীমানায় লোকজন কেউ হাঁটে না। গাছও যত, পাখিও তার থেকে কিছু কম নয়।

বন্দুকটা নজরুলের হাতে দিয়ে বললাম, মারো এইবার যত পারো।

কেমন করে চালাতে হয় শিখিয়ে দেবার প্রয়োজন হলো না।

কিন্তু পাখি সে কিছুতেই মারবে না। নাই বা মরল গায়ে তো লাগতো!

অথচ নজরুল সে রাস্তা মাড়ালে না। গোরস্থানের একদিকে সারি সারি কয়েকটি ইট-বাঁধানো বেদীই তার লক্ষ্য। তার ভেতর একটি বেদী হলো বড়লাট, একটি হলো ছোটলাট, একটি হলো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আর একটি হলো এস্-ডি-ও। তারপর একের পর এক চলতে লাগল তাদের ওপর আক্রমণ এবং সংহার।

ইট দিয়ে বাঁধানো চুন-কাম করা বড় বড় বেদী। বেশী দূরেও নয়, মারতে গেলে পাখির মত উড়েও পালায় না। কাজেই হাতের তিকের বিশেষ প্রয়োজন নেই। গোল গোল সীসের গুলী এয়ারগানের নলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে ফটাস্ ফটাস্ করে বিঁধতে থাকল দেশের শত্রু ইংরেজদের গায়ে।

একটা গুলী লাগে, আর নজরুলের সে কী উল্লাস!

নজরুলকে সেদিন বলেছিলাম, আমার আজও মনে আছে—'ওরা কি দোষ করলে বল তো? বড়লাট, ছোটলাট—ওরা তো চাকরি করে, কর্মচারী মাত্র।'

নজরুল বললে, না। ওরা ইংরাজের প্রতিনিধি। ইংরেজ মাত্রেই আমাদের শত্রু। ওরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাক।

—নইলে কি তুমি ওদের মেরে তাড়াবে ?

—চেষ্টা করব। প্রাণের ভয়ে এদেশে কেউ আর আসতে চাইবে না।

এমনি করে পঞ্চুর এয়ারগান নিয়ে চলতে লাগল আমাদের ইংরেজ মারার মহড়া।

গুলী ফুরিয়ে গেলেই পঞ্চুর কাছে যাই, আবার কতকগুলো ছড়্‌রা নিয়ে আসি চেয়ে।

ভয় হয় এবার বুঝি সে বন্দুকটা চাইবে। কিন্তু চাওয়া দূরে থাক, বন্দুকের নামও সে করে না। নজরুলের বিছানার তলায় বন্দুকটা লুকোনো থাকে। বিকেলে রোজ বন্দুক হাতে নিয়ে আমরা বাগানে যাই। কেমন যেন নেশা ধরে গেছে।

পঞ্চুর কাছে সেদিন ছড়্‌রা চাইতে গিয়ে দেখি, মোটা একটা বইয়ের পাতা থেকে পঞ্চু কাঁচি দিয়ে কি যেন কাটছে।

কাছে গিয়ে দেখলাম সম্রাট পঞ্চম জর্জের একটি রঙিন ছবি। •

কি হবে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললে, খুব ভাল করে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙাবো।

পঞ্চম জর্জের আর একখানি বড় ছবি ছিল দেয়ালে টাঙানো। বললাম, ওই তো রয়েছে একখানা, আবার এটা কেন ?

পঞ্চু বললে, এই ছবিখানা ওর চেয়ে অনেক ভাল। আচ্ছা, তুমিই বল তো দুখু মিঞা ?

ছবিখানা না দেখেই দুখু মিঞা বললে, খুব ভাল। কিন্তু সম্রাটের ওপর তোমার এত অচলা ভক্তি কেন বল দেখি ?

পঞ্চু বললে, বা-রে, এত বড় একটা মানুষ, আর ভক্তি করব না। সারা পৃথিবীর মধ্যে ওঁর রাজত্ব কত জানো ?

এই বলে সে হুড় হুড় করে ইংরেজ-অধিকৃত দেশগুলির নাম একটির পর একটি তোতাপাখির মত মুখস্থ বলে যেতে লাগল। সে-সব দেশ কোথায়, তার শাসন-ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, সেখানকার

রাজপুরুষদের বেতন, চাকরির মেয়াদ—এ-সব কথা পঞ্চু যখন নির্ভুলভাবে বলে যায়, ইস্কুলে সে যে ভাল ছাত্র নয়—পরীক্ষায় সে যে পর পর দু'বছর পাশ করতে পারেনি, সেকথা তখন মনেই হয় না।

নজরুল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল এতক্ষণ। কথা শেষ হতে পঞ্চুকে বললে, তোমার বন্দুকটা আমি কাল দিয়ে যাব।

পঞ্চু বললে, কে চাইছে? ও-বন্দুক আমি আর কোন দিন ছোঁব না প্রতিজ্ঞা করেছি।

নজরুল হেসে উঠল।—শখ মিটে গেল তা'হলে?

পঞ্চু বললে, বন্দুকের শখ আমার তো নয়। তোমার।

আমি বললাম, বেশ তাহলে বন্দুকটা নজরুলকে দিয়ে দাও।

পঞ্চু বললে, দিয়ে তো দিয়েছি।

নজরুল বললে, ভাল। এখন কিছু ছড়্‌রা দাও তো! ফুরিয়ে গেছে।

পঞ্চু তার ড্রয়ার টেনে ছড়্‌রার পুরনো প্যাকেটটা ধরে দিলে।

আমরা উঠে আসছি এমন সময় পঞ্চুর জ্যেঠাইমা আমাদের জন্য মুড়ি আর চা নিয়ে এলেন।

জ্যেঠাইমাকে দেখেই তাঁর হাতের দিকে আমার নজর চলে গেল। সেদিন পঞ্চুর গুলী খেয়ে হাতের বেশ খানিকটা অংশে চুন লেপেছিলেন দেখে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, হাতের বেদনা কমেছে?

জ্যেঠাইমা বললেন, হ্যাঁ বাবা, সেরে গেছে।

কথাটা পঞ্চু শুনতে পেয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি জানো তাহলে?

বললাম, সেদিন দেখে গেছি।

পঞ্চু বললে, সেইজন্যেই প্রতিজ্ঞা করেছি বন্দুক আমি আর ছোঁব না।

ক্রিশ্চানদের গোরস্থান ছেড়ে দিয়ে আমরা তখন এসেছি আমাদের বাগানে। বাগানের পশ্চিমদিকের প্রাচীরের কোলে সারি সারি পেঁপে গাছ। সে গাছে তখন বড় বড় পেঁপে ধরেছে।

এয়ারগানে হাত-বশ করতে হলে বড় বড় পেঁপে হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। সীসের ছড়্‌রা পেঁপের গায়ে 'প্যাক্‌ করে গেঁথে যায়। গুলী ঠিক লাগল কিনা বোঝবার ভারি সুবিধে।

প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হয়েছিল নজরুলের।

গোরস্থানের বেদীটা ছিল বড়, বন্দুকটা কোনোরকমে চালিয়ে দিলেই যেখানে হোক লেগে যেতো, কিন্তু পেঁপে তার চেয়ে অনেক ছোট, হাতের নিশান। পাকা না হলে পেঁপের গায়ে গুলী লাগানো বড় শক্ত।

তিনদিন লাগল নজরুলের হাত ঠিক করতে।

প্রথম যেদিন গুলী লাগল পেঁপের গায়ে, নজরুলের সেদিন সে কী আনন্দ! যেন বড় একটা ভূখণ্ড জয় করল।

সেই পেঁপে গাছটাই হলো বড়লাট।

তার পরের গাছটা ছোটলাট, তার পরেরটা ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর এস-ডি-ও, তারপর থানার বড় দারোগা, ছোট দারোগা ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রেণী অনুযায়ী সব সাজান।

বলেছিলাম, না না, থানার দারোগাদের মেরো না। ওরা তো ইংরেজ নয়, ওরা বাঙালী।

নজরুল বলেছিল, হোক বাঙালী! ওরা বিশ্বাসঘাতক। ওরা নিমকহারাম। একদিনে সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইংরেজের রাজত্বটা অচল করে দিক না!

এমনি-সব কথা, আর বন্দুক দিয়ে ইংরেজকে মেরে তাড়াবার আমাদের সেই মহোৎসব জোরে চলতে লাগল কয়েকদিন ধরে।

ছড়্‌রা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, ওদিকে বায়োস্কোপের কথাটাও

পঞ্চুকে বলা হচ্ছে না, অথচ সে থাকে আমাদের বাগানের ঠিক পাশেই।

নজরুলকে সেদিন বললাম, চল যাই পঞ্চুর কাছে। আরও কিছু ছড়্‌রা নিয়ে আসি।

নজরুল বললে, দাঁড়াও, ওর পঞ্চম জর্জকে খতম করি আগে।

বললাম, না না, ও-বেচারা অনেক দূরে থাকে, ওর সঙ্গে আমাদের শত্রুতা করে লাভ কি?

নজরুল বললে, ওই তো পালের গোদা। ও তো ফট করে একদিন সবাইকে ডেকে বলে দিতে পারে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম। ব্যস, ল্যাটা চুকে যায়, এক দিনেই আমরা স্বাধীন।

—ঠিক বলেছ। তাহলে লাগাও—ওকে আজই শেষ করে দাও।

কিন্তু না, অত সহজে ওকে মারা চলবে না।

কিছুক্ষণ আগেই আমি মেরেছি পুলিশ-সাহেবকে। মেরেছি অনেক দূর থেকে, প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে, খুব সাবধানে। দূরের একটা গাছের সবচেয়ে ছোট একটি পেঁপে হয়েছিল পুলিশ-সাহেব।

নজরুলকেও ঠিক অমনটি করে মারতে হবে। সবচেয়ে দূরে যে পেঁপে গাছটা রয়েছে, সেই গাছের বড় একটি পেঁপের গায়ে লাগাতে হবে পর পর দুটো গুলী।

পেঁপেটি দেখিয়ে দিলাম। হাঁটু গেড়ে বসলো নজরুল। কায়দা করে ধরলে বন্দুকটা। এক চোখ বন্ধ করে নিশান করলো, তারপর ফটাস—

ব্যস্! প্রথম গুলীটাই গিয়ে গেঁথে গেল। চললো আমাদের ধেই ধেই করে নৃত্য!

নজরুল চুপ করে থাকবার ছেলে নয়। চেঁচিয়ে বলতে লাগল—খতম! পঞ্চুর পঞ্চম জর্জ খতম!

—এত আনন্দ কিসের?

দেখলাম, হাসতে হাসতে পঞ্চু এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

একটা চিমটি কেটে নজরুলকে চেঁচাতে বারণ করলাম। রাজভক্ত রায়বাহাদুর আসছে যে! চুপ, চুপ!

চুপ করা দূরে থাক, হাত বাড়িয়ে পঞ্চুর গলাটা জড়িয়ে ধরলে নজরুল। তারপর লাফাতে লাফাতে বলে দিলে, দিলাম তোমার পঞ্চম জর্জকে একেবারে খতম করে।

কথার মানেটা বুঝতে পারলে না পঞ্চু। বোকার মত সেও নজরুলেব কোমরটা জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগল। যেন কত আনন্দ। বেটে মানুষ, গলাটা তার নাগাল পেলে না।

নজরুল তাকে আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিলে।

পেঁপে গাছগুলোর কাছে পঞ্চুকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রতিটি গাছেব সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় করিয়ে দিলে। এইটি বড়লাট, এইটি ছোট লাট······

সবার শেষে বড় পেঁপে গাছটিকে দেখিয়ে বললে, এইটি হল তোমাব পঞ্চম জর্জ।

—তারপর?

তারপর এই ছ্যাখো। এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার বন্দুক দিয়ে তোমাব পঞ্চম জর্জকে—

বন্দুকটা একবার চালিয়ে নজরুল দেখিয়ে দিলে। দেখিয়ে দিলে, কেমন করে একে একে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। এদের খতম না করলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না।

নজরুলের দিকে হাত বাড়িয়ে পঞ্চু বন্দুকটা নিলে। নিয়ে বললে, কঁর তোমরা ভারতবর্ষ স্বাধীন। কিন্তু খবরদার আমার বন্দুক দিয়ে নয়।

এই বলে পঞ্চু আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ল না। বন্দুকটি হাতে নিয়ে সে সোজা চলে গেল তার বাড়িতে।

আমি যচ্ছিলাম পঞ্চুর কাছ থেকে বন্দুকটা চেয়ে আনতে। নজরুল আমার হাতটা সজোরে চেপে ধরলে। যেতে দিলে না। বললে, না যেয়ো না।

চার

নজরুল ভাল করে কথা বলছে না। বুঝলাম তার লেগেছে খুব। পঞ্চুর কাছ থেকে বন্দুকটা আমি সহজেই চেয়ে আনতে পারতাম, কিন্তু নজরুল আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না।

বন্দুক চালানোর একটা নেশা আছে। নেশাটা ঠিক পাখী মারার জন্য নয়। গুলীটা ঠিক জায়গায় লাগাতে পারার নেশা। নজরুল যদি কাঁচা পেঁপের গায়ে গুলী ঠিক লাগাতে না পারতো, তাহলে তার লাট-বেলাট মারার নেশা দু'দিনেই ছুটে যেতো।

পরের দিন হাতটা নিস্‌পিস্ করেছিল আমারও। ভাবলাম, যাই একবার পঞ্চুর কাছে। গিয়ে বলি, 'খুব অন্যায় হয়েছে তোমার। বন্দুকটা কেন নিয়ে এলে? দাও।'

কিন্তু কি যে হলো সেদিন, পঞ্চুর বাড়ির দোর পর্যন্ত গিয়েও আর ঘরে ঢুকলাম না, সোজা চলে এলাম নজরুলদের বোর্ডিং-এ।

গিয়ে দেখি, নিজের খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে নজরুল কি যেন লিখছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ইস্কুলে যাওনি?

কই আর গেলাম! বলে তার লেখাটি আমার কাছে ফেলে দিয়ে বললে, নাও পড়। তোমার অন্ন মেরে দিলাম। কবিতা লিখলাম।

দেখলাম, সেদিনের সেই চড়ুই পাখীটাকে নিয়ে লেখা হয়েছে। লিখেছে—

মস্ত বড় দালান বাড়ীর উই লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট একটি চড়াইছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।
'চু' 'চা' রবের আকুল কাঁদন যাচ্ছিল সে পবন-বায়ে
মায়ের পরাণ—ভাবলে বুঝি দুষ্ট ছেলে নিচ্ছে ছায়ে।

১। ছা—মানে বাচ্চা। আমাদের ও-অঞ্চলে পশুপাখীর বাচ্চাকে বলে 'ছা'।

অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটলো মাতা ফড়িং মুখে
স্নেহের আকুল আশিস জোয়ার উথলে উঠে মার সে বুকে!
আধ-ফুরফুরে ছা'টি নীড়ে দেখছে মা তার আসছে উড়ে,
ভাবলে আমিই যাই না ছুটে, বসিগে মার বক্ষ জুড়ে।
হৃদয়-আবেগ রুধতে নেরে[১] উড়তে গেল অবোধ পাখী
ঝুপ করে সে গো। পড়ে—ছুবল মায়ের করুণ আঁখি।
হায়রে মায়ের স্নেহের হিয়া বিষম ব্যথার উঠলো কেঁপে
রাখলে নাকো প্রাণে। মার, বসল ডানায় ছা'টি ঝপে।
ধরতে ছুটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্ট ছেলে
ছুটছে পাখী প্রাণের ভয়ে ছোট দুটি ডানা তুলে।
বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন
বুঝে না কেউ স্কুলের ছেলে মায়ের সে যে বুকভরা ধন।
পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে,
একটি ছেলে দেখছে অশ্রু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।
সে মরেছে বহুদিন তার ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ
তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠল বেজে করুণ বেহাগ।
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে
ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশিস প্রাণ খুলে।
অবাক-নয়ান মা টি তাহার রইলো চেয়ে পাড়ের পানে.
হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
পাখীর মায়ের নীরব আশিস যে বারাটি দিল ঢেলে
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে।*

এমনি কবিতা লিখেও সে যদি বন্দুকের কথা ভুলে থাকে তো থাক। আমি ক্রমাগত, দেখা হলেই তাকে কবিতা লেখার তাড়া দিতে লাগলাম।

তিন দিন পরে দেখলাম আবার আর একটা লিখেছে। কবিতাটির নাম দিয়েছে 'রানীর গড়'। কবিতাটি চমৎকার।

১। নেরে—না পেরে (আঞ্চলিক)।

[*আজ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে লেখা এই কবিতাটি আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। এমনি আরও কিছু বাল্যের স্মৃতিচিহ্ন ছিল আমার কাছে। কিছু তার আছে, কিছু হারিয়েছে। এখন শুধু মনে মনে ভাবি—অনেক মূল্যবান বস্তুই তো হারিয়েছি, কোনও কিছু সঞ্চয় করে রাখা ধর্মই আমার নয়, তবু এমন কী মূল্য আমি এর মধ্যে দেখেছিলাম, যার জন্য যখের ধনের মত কয়েক টুকরো কাগজ আমি আগলে রেখেছি।]

তার পরে লিখেছিল 'রাজার গড়'। সেটিও অপ্রকাশিত। আছে আমার কাছে। এ কবিতাটির কথা আমি প্রথমে লিখেছি।

নজরুল যখন এমনি করে একটির পর একটি কবিতা লিখে চলেছে, তখন একদিন একটা ঘটনা ঘটলো। মজার ঘটনা।

ছিনু তখনও রয়েছে তাদের বোর্ডিং-এ। যে-ছিনুর কথা লিখেছি প্রথন পরিচ্ছেদে—সেই ছিনু মিঞা।

আমি গেছি বোর্ডিং-এ। দেখলাম নজরুল তার খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, বুকের নীচে একটা বালিশ নিয়ে একমনে কি যেন লিখে চলেছে। খোলা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে লিখছিল। আমাকে দেখতে পাবার কোন সুযোগ ছিল না।

হাতের ইশারায় ছিনু আমাকে কাছে ডাকলে। কথা না বলেই বাইরে বেরিয়ে এলাম। নজরুল বুঝতেই পারলে না যে আমি এসেছি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ছিনু একা একা চা তৈরি করছিল, আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসালে। তালপাতার চাটাই-এর ওপর চেপে বসে ওর মুখের দিকে তাকালাম। এক পেয়ালা চা আমার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, খাও মিঞা-সাহেব, গরম চা খেয়ে আগে ঠাণ্ডা হও, তারপর বলছি তোমাকে কেন ডাকলাম।

বললাম, তুমি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথা।

—কই বল দেখি কি বুঝেছ?

বললাম, আমি বসে থাকলে ওর লেখা হবে না, তাই তুমি আমাকে সরিয়ে আনলে।

ছিনু বললে, না, তুমি বুঝতে পারোনি মিঞা-সাহেব। কাল থেকে দুখু মিঞার সঙ্গে আমার রা-কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ! বল কি? এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

যে-ছিনু নজরুলকে তার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে, সেই নজরুলের সঙ্গে হলো তার ঝগড়া! ঠিক বিশ্বাস হয় না।

হেসে বললাম, এ তোমাদের প্রেমের ঝগড়া ছিনু, এক্ষুণি দেখবো ভাব হয়ে গেছে।

ছিনু বোধ করি আমার কথাটা শুনে রাগ করলে। বললে, তুমি তো তা বলবেই। তুমিই হচ্ছ যত নষ্টের গোড়া! এমনটি করলে কে? তুমি না?

কথাটা তখন বুঝতে পারিনি। বললাম, 'কি করলাম?'

—করলে না?

ছিনুর রাগ আমি কখনও দেখিনি। ডাঁট-ভাঙা একটা কাপে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চা খাচ্ছিল ছিনু। কাপটা ঠক করে নামিয়ে দিয়ে সে যেন ধেই ধেই করে লাফিয়ে উঠলো! বললে, এ-বিদ্যে ওকে কে শেখালে? এই যে আজ চারদিন ধরে দিনরাত মুখ গুঁজে পড়ে আছে, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, এ সব কী? বলতে পারো? বেলা দুটোর সময় হুকুম হলো—ছিনু চা দে। তাই দিলাম। গরম চা জুড়িয়ে জল হল। মুখে দিলে না। বলতে গেলাম তো বললে আবার গরম কর। দিলাম গবম করে। ব্যস্, তাও খেলে না। জল হ'ল। না-খেলি তো না-খেলি! বললাম, চা-টা তো আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

বাবু মেজাজ দেখিয়ে বললে, যাকগে, তোর কি?

আমার কি, আমার বয়ে গেল! এই চায়েব পাট দিলাম তুলে, এবার কি খাবি খা।

বলেই সে ঘটির জলটা আঁচে ঢালতে যাচ্ছিল। ঘটিটা কেড়ে নিলুম তার হাত থেকে। এক রকম জোর কবেই কেড়ে নিলাম।

বললে, আসল কথাটাই তো বলা হয়নি এখনও। শোনো। পাঁচ পয়সার কেরোসিন তেল কিনি, তিনদিন চলে। কাল বিকেলে তেল কিনে লণ্ঠন ভর্তি করে দিয়েছি, আর আজ সকালে দেখি লণ্ঠন একেবারে শুকনো ঠন্ ঠন্ করছে। বুঝতেই পারছো—বাবু কাল সারারাত না ঘুমিয়ে পদ্য লিখেছে। অপরাধের মধ্যে লণ্ঠনটা দেখিয়ে

বলতে গেলাম—বলি, ইস্কুলের পড়া তো কোনদিন এমন করে পড়তে দেখিনি, এক রাতেই এক লণ্ঠন তেল শেষ! তা সে করলে কি জানো? তেড়ে আমাকে মারতে এলো। লণ্ঠনটা দিলে আমার গায়ে ফেলে! কাঁচটা ভেঙে একাকার। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল চারপাশে।

ছিন্নুর কথা বিশ্বাস হলো না। বললাম, এ রকম রাগ তো আমি ওর কোনোদিন দেখিনি ছিন্নু। তুমি তেলের কথা বললে, আর নজরুল ছুঁড়ে দিলে লণ্ঠনটা?

ছিন্নুর মুখখানা এবার একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল। বললে, এই ছাখো, তুমিও আমাকে জেরা করছ ত? আমি কি মিছে কথা বলছি?

বললাম, না-না, আমি তা বলিনি। আমি বলছি, তুমি নিশ্চয় ওকে বিরক্ত করেছিলে।

ছিন্নু এবার হেসে ফেললে। ফিক করে হেসে বললে, তা ঠিক একটুখানি করেছিলাম। চুল ধরে দু'বার টেনে দিয়েছিলাম, আর ওই যে—যে খাতায় লিখছে, ওই খাতাটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

বললাম, তাহলে বেশ করেছে। তোমাকে মারে নি এই ঢের?

ছিন্নু বললে, বেশ করেছে? লণ্ঠনের কাঁচটা ভেঙে দিয়েছে, বেশ করেছে? আমি কিন্তু আর কাঁচ আনছি না! থাক ও অন্ধকারে, লিখুক দেখি কেমন করে লিখবে।

বললাম, না তুমি কাঁচ আর কেরোসিন তেল তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো, যাও।

"পারবো না। বলে ছিন্নু মুখ ফিরিয়ে বসলো।

ছিন্নুর কথা ফুরিয়েছে ভেবে উঠে আসছিলাম। ছিন্নু আসতে দিলে না। বললে, যেয়ো না মিঞা-সাহেব, শোনো।

—কেন, আবার কি শুনবো?

—আসছি, দাঁড়াও।

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে গজ গজ করতে করতে ছিনু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বললে, তুমি বললে তাই যাচ্ছি, নইলে যেতাম না কিছুতেই। তারপর একটু থেমে বললে, এসো আমার সঙ্গে।

—আমি আর নাই-বা গেলাম।

ছিনু কিন্তু ছাড়লে না। বললে, কেন মিছে মিছে লেখাটা বন্ধ করে দেবে? লিখছে লিখুক না! এসো।

সারাটা রাস্তা ছিনু বক্‌বক্‌ করতে করতে গেল।

—মাসের শেষ, এদিকে পয়সাগুলি শেষ করেছে, হাতে একটিও নেই। এইবার ওর ইস্কুলের বইগুলি আমি একটি একটি করে বেচে দেবো।

বললাম, কেন? বই বেচবে কেন? বই কি করল?

ছিনু বললে, কি হবে বইগুলো? ইস্কুলের বই তো ও ছোঁয় না!

বললাম, ছোঁবে, ছোঁবে। এমন ভাবে রাগ করছো কেন?

—রাগ করবো না?

ছিনু বললে, ছাখো মিঞা-সাহেব, দুখু মিঞার ঘরে ভাত নাই, গরীবের ছেলে, ওর বাড়িতে যে কি কষ্ট তা আমি জানি। কোন-রকমে লেখাপড়া যদি একটু শিখতে পারে তা হলে কয়লাখাদে যেমন করে হোক একটা চাকরিবাকরি জুটবে। ওর কি এইরকম করা সাজে? কই তুমিই বল না!

কি আর বলবো, কিই বা বলা যায়। চুপ করেই রইলাম।

ছিনু তার কথা বলে যেতে লাগলো, এমনি করে যদি ইস্কুল কামাই করে তো রাজবাড়ির টাকাটি বন্ধ হতে আর কতক্ষণ! হেড-মাষ্টার ঘ্যাঁচ করে নামটি কেটে দিলেই হল। ব্যস, যে-দুখু মিঞা সে সেই-দুখু মিঞা! বাড়ি গিয়ে পাল পাল গরু চরাও, আর রোদে জলে নাঙ্গল ধরো! ও কিন্তু তাও পারবে না, এই আমি বলে দিলাম তোমাকে, তুমি দেখে নিও!

এই বলে সে খানিক থামলো। সামনেই দোকান। লণ্ঠনটা দোকানীর হাতে দিয়ে বললে, ভাল দেখে একটি কাঁচ দাও তো ভাই, বেশ পুরু সুরু। চট্ করে যাতে না ভাঙে।

বলেই সে পয়সা বের করতে করতে বললে, তোমার কি, তুমি বড় লোকের নাতি, এ সব দুঃখুর কথা কিছু বুঝবে না।

কাঁচটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কাঁচের দাম মিটিয়ে ছিনু চললো তেল আনতে। পথ চলতে চলতে আবার বললে, তুমি যদি একটি কাজ কর তো দু'দিনেই আমি ওকে আচ্ছা জব্দ করে দিতে পারি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি কাজ?

বলতে বোধ হয় সে ইতস্তত করছিল। মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, বলবো?

—হ্যাঁ বল।

ছিনু বললে, তুমি যদি দিনকতক না আসো তো ওর পদ্য লেখা আমি বন্ধ করে দিই!

বুঝলাম, আমিই দায়ী। আমাকেই সব-কিছুর জন্য দায়ী করেছে ছিনু।

স্কলারশিপ পাবার মত ছেলে নজরুল। প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়। আর এই লেখার নেশায় মেতে যদি ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে, কি রেজাল্ট খারাপ হয় তো আর-কেউ কিছু না বলুক, ছিনু আমাকে ছাড়বে না।

বললাম, বেশ, যাব না।

নজরুলের মঙ্গল কামনায় একথা বলিনি। তার কবিতা লেখা বন্ধ হোক ভেবেও নয়। আজও আমার বেশ মনে আছে—বলেছিলাম ছিনুর ওপর রাগ করে।

লণ্ঠনে তেল নিয়ে বোর্ডিং-এ ফেরার পথে ছিনুর সঙ্গে খানিকটা এলাম। তারপর একসময় দাঁড়িয়ে পড়লাম। ছিনু বললে, দাঁড়ালে যে—এসো।

বললাম, থাক আর যাব না। তুমি যাও।

ছিনু বোধ হয় খুশীই হলো। বেশ লম্বা পা ফেলে বোর্ডিং-এর পথ ধরল।

পাশেই খোঁয়াড়। ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খানিকটে জায়গা। যে-সব গরু-ছাগল অন্যের ক্ষেতে-বাগানে ঢুকে, আবাদ-ফসল, গাছ-পালা খায়, তাদের ধরে এনে এই খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গরু-ছাগলের মালিক পয়সা দিয়ে তাদেব ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। সরকারী খোঁয়াড়। বছরের শেষে নিলাম-ডাকের মত 'ডাক' হয়। ডাকের টাকা জমা দিয়ে পুরো একবছরের জন্য যে-লোক এই খোঁয়াড়ের ইজারা নেয়, তাকেও বসে থাকতে দেখি রাস্তার ধারে—একটি ছোট ঘরে।

নজরুলের বোর্ডিং-এ যাওয়া-আসার পথে খোঁয়াড়-মুন্সিব ছোট ঘরখানি রোজই আমাব নজরে পড়ে, কিন্তু সেদিকে বড় একটা তাকাই না। হয় তো তাকাবার প্রয়োজন হয় না বলে তাকাই না।

চিনু চলে যাবার পর সেদিন দাঁড়িয়েছিলাম খোঁয়ার-মুন্সির ঘরটার কাছেই। মনের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। যে-ছিনু কথায় কথায় হাসায়, সেই ছিনুই আজ আমাকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। কি করবো, কোথায় যাব ভাবছি, এমন সময় দেখি—কান-কাটা জগা হেট্ হেট্ করতে করতে দুটো গরু তাড়াতে তাড়াতে সেইদিকেই আসছে।

ঠিক রাস্তার মাঝখানে ছিলাম, গরু দুটোকে আসতে দেখে একটু সরে দাঁড়ালাম। আমার দিকে নজর পড়ল জগার। জগা কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

অপ্রস্তুত হবার কারণটা বুঝলাম। সে-ও যে বোঝেনি তাও নয়।

গরু দুটো সে খোঁয়াড়ে দেবার জন্যেই এনেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কার-কি খেয়েছে রে জগা ?

কিন্তু আমার কথার জবাবই দিলে না সে। অপ্রস্তুত ভাবটা

কাটিয়ে নিয়ে চেঁচাতে লাগলো, খেঁায়াড়-মুন্সি! খেঁায়াড়-মুন্সি!

পাতলা ছিপছিপে খেঁায়াড়-মুন্সি বেরিয়ে এলো রাস্তার ধারের সেই ছোট্ট ঘর থেকে। এসেই সে তাড়াতাড়ি তালা-দেওয়া ফটক খুলে দিল। গরু দুটোকে আগে ঢুকিয়ে দিলে প্রাচীরঘেরা সেই জায়গাটায়। তারপর আবার সে তার ঘরের দিকে এগুলো। কান-কাটা জগা গেল তার পিছু পিছু।

ঘরের ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল না। এক পা এগিয়ে যেতেই দেখলাম—খেঁায়াড়-মুন্সি কাগজের ওপর কি যেন লিখলে, তারপর কাঠের একটি হাত-বাক্স থেকে পয়সা বের করে জগার হাতে দিলে। বললে, যা—দু'পয়সা বেশীই দিলাম।

পয়সা নিয়ে জগা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, শ্লা দু'গণ্ডা পয়সা দিলে মাইরি। ঝগড়া করে মা সারাদিন কিছু খায়নি। দিইগে যাই।

বলেই সে ছুটে পালালো সুমুখ থেকে।

মা মানে ছুতোর-বৌ। আমাদেরবাড়ির পাশেই থাকে। ছুতোর-দের মেয়ে যে এত সুন্দরী হতে পারে জগার মাকে না দেখলে তা' কেউ বুঝবে না। কান-কাটা জগার বয়স যদি হয় পনেরো-ষোলো তো জগার মা'র বয়স বোধ করি তিরিশ-বত্রিশ।

ছোট-খাটো বেঁটে মেয়েটি, গায়ের রঙ একেবারে দু'ধে-আলতা।

গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে। জগা তখন তার কোলে—খুব ছোট।

পাড়ার মেয়েরা দেখতে আসতো। বলতো, আহা, যেমন মা—তেমনি ছেলে!

ছেলের কাটা কানটি সে সব সময় ঢেকে রাখবার চেষ্টা করতো।

কিন্তু দেখতে যারা এসেছে, তাদের চোখ এড়ানো সহজ নয়। তারা জিজ্ঞেস করে, ছেলের কানে কি হয়েছিল ছুতোর-বৌ?

জগার মা সত্যি কথাই বলতো। বলতো, গ্রামে আমার শ্বশুর-

বাড়ি ছিল একটা জঙ্গলের ধারে। মাটির ঘর, ভাঙা দেয়াল, অবস্থা তো ভাল ছিল না! একদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি, ছেলে কোলে নেই। খোঁজ, খোঁজ। জগার বাবা বেরুলো কুড়ুল কাঁধে নিয়ে। পাড়ার লোক বেরুলো। ফিরে এলো দুপুর বেলা। ছেলেটাকে পাওয়া গেছে এক জঙ্গলের ধারে। শেয়ালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কানটা কাটা, সারা মুখে গায়ে কাঁচা রক্ত! যাক মরেনি, এই ঢের।

অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়ে তুললাম। তার পরেই গ্রামের বাড়ি-ঘরদোর ছেড়ে আমরা চলে এলাম এই শহরে।

কাঠের কাজ বেশ ভালই করতো জগার বাবা। দিন তাদের বেশ ভালই চলতো। ছেলেটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো। কিন্তু হলে কি হবে? লেখাপড়া শিখলে না। বেকার হয়ে থাকল।

ছুতোর-বৌ বলতো, ভাল কাজ হচ্ছে না কিন্তু। ছেলেকে এত আদর দিও না। ওকে লেখাপড়া শেখাও।

জগার বাবা বলতো, একটা মাত্তর ছেলে, দেখো ওকে আমি বড় মিস্ত্রি করে তুলবো। তুমি দেখে নিও। খুব ভালো কাঠের কাজ শিখিয়ে দেবো। কত টাকা আয় করবে।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে, সবসময় তা হয় না। জগা যখন দশ বছরের ছেলে, তখন একদিন সব শেষ হয়ে গেল। জগার বাবা গেল মরে। একেবারে অকস্মাৎ!

অকূল পাথারে পড়ে গেল ছুতোর-বৌ।

পড়লো, কিন্তু ডুবলো না। দশ বছরের অকর্মণ্য ছেলেকে জড়িয়ে ধরে একাই ভেসে চললো তার দিকচিহ্নহীন সংসার-সাগরে।

সেই দশ বছরের ছেলে আজ ষোলো বছরের মস্ত জোয়ান! সকাল থেকে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। বেলা বারোটার সময় বাড়ি এসে বলে, মা, খেতে দাও!

মা আর কতদিন মুখ বুজে চুপ করে থাকে!

ভাতের থালা মুখের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে, এই শেষ! কাল থেকে আর পাবে না।

কিন্তু কালও সে তাকে না দিয়ে পারে না। যথাসময় ভাতের থালাটি এগিয়ে দেয়।

এমনি করে দিনেব পর দিন পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি করে, মুড়ি বেচে ছুতোর-বৌ তার জোয়ান ছেলের পেট ভরায়, আর প্রাণপণে গালাগাল দেয়।

তার সে গালাগালি আমরা রোজই শুনি।

আজও বোধহয় তেমনি গালাগালি দিয়েছে। ছেলের ওপর অভিমান করে হয়তো সে না খেয়ে পড়ে আছে। ছেলে তাই গরু খোঁয়াড়ে দিয়ে দু'আনা পয়স রোজগার করে মায়ের রাগ ভাঙাতে গেল।

গরু দুটোর কোন অপরাধ ছিল না—আমি নিজে দেখেছি। পথের ধারে ঘাস খাচ্ছিল, জগা আসছিল সেই পথ দিয়ে। গরু দুটোকে দেখে হঠাৎ তার কি খেয়াল হলো, হেট্ হেট্ করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ালো একেবারে খোঁয়াড়ের দরজায়।

গরু ছাগলের মালিককেই জানি পয়সা দিয়ে খোঁয়াড় থেকে গরু ছাগল ছাড়াতে। কিন্তু যে লোক গরু ছাগল ধরে এনে খোঁয়াড়ে দেয়, সেও যে কিছু রোজগার করে সেকথা আমার জানা ছিল না।

পথের ধারে আমাকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে খোয়াড়-মুন্সি ভাবলে বুঝি আমি তাকে কিছু বলবো। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, এসো না ভেতরে। ওখানে দাড়িয়ে আছ কেন?

জগার কথাটা বলবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। বললাম, জগা বুঝি এমনি করে গরু-ছাগল ধরে এনে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে পয়সা নিয়ে যায়?

খোঁয়াড়-মুন্সির বয়স বেশি নয়। চেহারা দেখলে মুসলমান

বলে চিনতে দেরি হয় না। লোকটি হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে এসে আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরল। তারপর সেই ছোট ঘরখানির ভেতর টেনে নিয়ে গেল। টিনের একটি চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললে, বোসো।

বসতে চইছিলাম না, কিন্তু খোঁয়াড়-মুন্সি ছাড়ে না। বসতে হলো।

কাঠের একটা তক্তপোষের ওপর শতরঞ্জি পাতা। তারই ওপর সে নিজে বসলো। বসেই একটি কাগজের ঠোঙায় কয়েকটি সাজা পান আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, খাও।

বললাম, খাই না।

—বিড়ি খাবে?

বললাম, না।

—সিগ্রেট?

—না।

খোঁয়াড়-মুন্সি এইবার একটি পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধরিয়ে আচ্ছা করে চেপে বসলো। বসেই বলল, ছাগল গরু যারা নিয়ে আসে তাদের দু-একটা পয়সা আমরা দিই।

বললাম জগাকে দেওয়া বোধ হয় আপনার অন্যায় হলো। রাস্তার ধারে চরে চরে গরুদুটো ঘাস খাচ্ছিল, জগা ওদের সেইখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো আমি দেখলাম।

গরু কোত্থেকে নিয়ে এলো—মুন্সিকে কি তাও দেখতে হবে? বলতে বলতে যে-ছেলেটি বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে, তার দিকে তাকিয়ে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। ছেলেটি আমারই সঙ্গে পড়ে, আমারই সমবয়সী—সতীশ।

ছোট এই ঘরটার ভেতরে আর-একটা যে অন্ধকার খুপরি আছে তা জানতাম না। সতীশকে যে এ-অবস্থায় এখানে দেখবো তা আমি ভাবতেও পারিনি। বড়লোক এক উকিলের ছেলে সতীশ। আমাদের ক্লাশের একজন নামকরা ভাল ছেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওখানে তুমি কি করছিলে সতীশ ?

সতীশ অম্লানবদনে বলে বসলো, বিড়ি টানছিলাম।

সতীশ যে বিড়ি খায় তাও জানা ছিল না। অবাক হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সতীশ কিন্তু নির্বিকার। সে ভাল করে চেপে বসলো খোঁয়াড়-মুন্সির পাশে। বললে, মুন্সি, ওকে একটা বিড়ি দাও না !

মুন্সি বললে, দিয়েছিলাম। খেলে না।

আমার দিকে তাকিয়ে সতীশ বললে, খাও না ! বেশ লাগবে। ভাল ছেলে হয়ে আর কতদিন থাকবে বাবা !

—ধেৎ !

—অমনি ধেৎ বলে ফেললে ! যখনই তোমার খাবার ইচ্ছে হবে এইখানে চলে আসবে, এই ঘরে তোফা আরাম করে বসে বসে টানবে, কেউ দেখতে পাবে না, কেউ জানতেও পারবে না।

বললাম, জান না তো আমার দাদা-মশাইকে, মুখে গন্ধ পেলে মেরে পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে দেবে।

সতীশ বললে, দাদামশাই তোমার মুখ শুঁকতে আসবে বুঝি। যাঃ ! কাছে যদি যেতেই হয় তো মুখটা চট করে ধুয়ে নেবে।

বললাম, বিড়ি টানবার জন্যেই তুমি এইখানে আসো বুঝি ?

সতীশ চট করে দুহাত বাড়িয়ে খোঁয়াড়-মুন্সিকে জড়িয়ে ধরে বললে, না। খোঁয়াড়-মুন্সি এই আলী-সাহেব আমাদের বন্ধু। না এলে চলে ?

বুঝলাম খোঁয়াড়-মুন্সির নাম আলী সাহেব।

একটু হেসে আলী-সাহেব বললে, বিড়ি-সিগ্রেট নাই-বা খেলে, এখানে আসতে দোষ কি ? এই দিক দিয়ে রোজই তো যাও দেখি। পঞ্চুলাটের বাড়ি যাও, মুসলমান বোর্ডিং-এ যাও।

বললাম, তাও জানো ?

আলী-সাহেব বললে, সব জানি।

সতীশ বললে, দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে আজ একটা খুব ভাল সিগ্রেট খাইয়ে দিচ্ছি। আগে পঞ্চু-লাট আসুক।

পঞ্চু-লাট সিগ্রেট খায় তাও আমার জানা ছিল না। বললাম, পঞ্চু সিগ্রেট খায়? আসে এখানে?

সতীশ বললে, হ্যাঁ, সব চেয়ে দামী যে-সিগ্রেট, সেই সিগ্রেট খায় ও। বিড়ি খায় না। বলে, বিড়ি যারা খায় তারা ছোটলোক।

এই বলে হাসতে লাগলো তারা দু'জনেই।

আমি তখন ভাবছি পঞ্চুর কথা। হঠাৎ যদি আসে এখানে তো দেখা হয়ে যাবে। দেখা হলেই কথা উঠবে বন্দুকের। তার চেয়ে থাক সে তার বন্দুক নিয়ে। আমি চলি।

উঠে দাঁড়াতেই সতীশ বলে উঠলো, দাঁড়াও না। পঞ্চুলাট এই এল বলে। তোমার নামে সিগ্রেট একটা আদায় করে না-হয় আমরাই খাব!

তোমরাই খাও! বলে আমি সেখান থেকে সত্যিই চলে এলাম।

কিন্তু কি কুক্ষণেই যে সতীশ তার বিড়ি খাওয়ার কথা আমার কাছে বলে ফেলেছিল! সেদিন থেকে সে আমার পেছনে লেগে রইলো। একেবারে নাছোড়বান্দা!

সিগারেট না-হোক, একটা বিড়ি অন্তত সে আমাকে খাওয়াবেই!

খাইয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

এই সতীশই আমার ধূমপানের দীক্ষাগুরু।

শিউলি ফুলের কড়া গন্ধের সঙ্গে আমার এই ধূমপানের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। হঠাৎ যদি কোনদিন শিউলি ফুলের গন্ধ আমার নাকে আসে, তৎক্ষণাৎ আমার মন চলে যায় সেই অতীত দিনে। স্পষ্ট পরিষ্কার একটি ছবি ভেসে ওঠে চোখের সুমুখে।

সেদিন ইস্কুলে টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে। যেমন পড়ে রোজ।

ঘণ্টা হ'তেই সতীশ আর আমি বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায়। সুমুখে পুরনো জেলখানার বড় বড় ভাঙা ভাঙা ইটের প্রাচীর। কোনটা-বা একেবারে ভেঙে পড়েছে, কোনটা-বা এখনও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল। তারই ভেতর দিয়ে একটু-খানি এগিয়ে, সিমেণ্ট-বাঁধানো পরিষ্কার একটা চত্বরের ওপর গিয়ে আমরা মুখোমুখি বসেছি। দু'জনে ধরিয়েছি দুটি সিগারেট। কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গায় ছোট একটি শিউলি গাছে অজস্র শিউলি ফুল ফুটেছে। টুপ্ টুপ্ করে একটি দুটি ফুল অনবরত ঝরে পড়ছে গাছের তলায়।

এখন আর সে ভাঙা ভাঙা বড় বড় প্রাচীরও নেই, সে শিউলি গাছও নেই। সব-কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু আমার মনে আছে তার অবিস্মরণীয় স্মৃতি। দুর্গের মত বড় বড় প্রাচীরঘেরা সেই পুরনো জেলখানার ধ্বংসাবশেষ, আর শিউলি ফুলের গন্ধে-ভরা মনোরম সেই নির্জন জায়গাটুকু!

খোঁয়াড়-মুন্সি আলী-সাহেবের আস্তানা ছেড়ে বাড়ি ফিরেই নজরুলের কথা বেশি করে মনে পড়লো।

ছিনু বলেছে, আমি যেন আর নজরুলের কাছে না যাই! আমিও বলেছি যাব না।

জানি, আমি না গেলেও নজরুল আসবে আমার কাছে।

আমি কিন্তু যাব না যাব না করেও তার পরের দিন বেরিয়ে পড়লাম নজরুলের সন্ধানে।

খোঁয়াড়ের সুমুখ দিয়ে যেতে হবে আমাকে। কান-কাটা জগার গরু তাড়ানোর ব্যাপার নিয়ে সদ্য-পরিচিত আলী-সাহেব যদি ডাকে? আমাদের চেয়ে বছর-দশেকের বড় এই মানুষটির সঙ্গে সতীশের এত ঘনিষ্ঠতা হলো কেমন করে? শুধুই কি বিঁড়ি-সিগারেট টানবার সুবিধা হবে বলে? না, আর-কিছু? এমনি সব নানান কথা তখন আমার মাথার ভিতর চক্কর দিচ্ছে।

না যদি কেউ ডাকে তো এড়িয়ে চলে যাব।

কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া আমার হলো না। ডাক শুনে থমকে থামলাম। চেয়ে দেখি, ছোট সেই ঘরখানির ভেতর থেকে সতীশ ডাকছে।

ঘরে গিয়ে বসতে হলো। মুন্সীকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার আলী-সাহেব কোথায়?

ছোট একটি জানালার পথে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে।

দেখলাম, খোঁয়াড়ের ভেতর অনেকগুলো গরু ছাগলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন সে বেশ জোরে-জোরে কথা বলছে।

সতীশ বললে, ঝগড়া করছে ওর ছোট ভাই-এর সঙ্গে। ওরকম ওদের রোজই হয়। এসো।

এই বলে সে আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। অর্থাৎ এসো ওই ছোট ঘরটায়।

আমিও যাব না, সেও ছাড়বে না।

শেষে আমারই হলো পরাজয়। সেই ঘরটার ভেতর আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সতীশ তার ফতুয়ার পকেট থেকে দুটি সিগারেট বের করলে। একটি আমার হাতে দিলে, আর একটি নিজে নিয়ে বললে, তোমার জন্যে কিনেছি। খাও।

—সিগ্রেট তুমি আমাকে খাওয়াবেই?

সতীশ বললে, হ্যাঁ খাওয়াবই।

দেশলাই দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে সতীশ পরমানন্দে ধোঁয়া বের করতে লাগলো। কিন্তু আমার হলো মুশকিল। আমাকেও ধরাতে হলো। টেনে টেনে বারকতক ধোঁয়া ছেড়েই সিগারেটটা নিবিয়ে, দিলাম দোরের বাইরে ফেলে।

ভাল লাগলো না এতটুকু।

বললাম, কি সুখে যে তোমরা এ-সব খাও কে-জানে!

সতীশ বললে, এমনি রোজ এক-আধবার করে টানলেই অভ্যেস হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারবে কোন সুখে খাই।

এদিকে তখন আলী-সাহেব আর তার ভাই এসে ঘরে ঢুকেছে। গোলমাল তখনও তাদের থামেনি। তাদের কথা বলবার সে এক বিচিত্র ভাষা! না হিন্দি, না বাংলা। তাড়াতাড়ি কথা যখন বলে শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু এক বর্ণও বোঝা যায় না। সতীশকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বুঝতে পারো?

সতীশ বললে, পারি। আলী-সাহেবের ভাই কি বলছে জানো? বলছে, প্রায়ই দেখি তুমি হিসেবে গোলমাল কর। এবার যদি কর তো তোমাকে আর আমি এখানে বসতে দেবো না; আমি বসবো।

আলী-সাহেব বলছে, ওটা আমি ভুল করে লিখেছিলাম। কাটতে ভুলে গেছি।

অন্ধকার ঘরটায় বসে থাকতে এতটুকু ভাল লাগছিল না। সতীশকে বললাম, চল বেরোই এখান থেকে।

সতীশের সিগারেট তখনও শেষ হয়নি। আমার একটা হাত সে চেপে ধরলে। বললে, দাঁড়াও, এটা শেষ করে নিই আগে। আলী-সাহেবের ভাইটা চলে যাক।

কাঠের ক্যাশ-বাক্সটি উজার করে টাকা-পয়সা যা ছিল ঢেলে নিয়ে আলী-সাহেবের ভাই চলে গেল।

সতীশের সিগারেটটা তখন শেষ হয়েছে।

আমাকে দেখে আলী-সাহেব বোধ হয় খুশী হ'ল। হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কখন এলে?

বললাম, তুমি তখন ভাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করছিলে।

আলী-সাহেব বললে, ওটা ওমনি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, আজ আবার হিসেবের ভুল হলো নাকি?

আলী-সাহেব হাসতে হাসতে বললে, হুটো একটা ওরকম হয়। নাও, বিড়ি খাও।

সতীশ বললে, এই মাত্তর খেলাম। বলে' তার খাতাটা তুলে নিলে। বললে, ভাই তোমার ভুল ধরলে কেমন করে দেখি!

খাতার পাতার একদিকে লেখা থাকে গরু ছাগল যে-কটা জমা হলো তার হিসেব, আর একদিকে থাকে, কার জন্যে কত পয়সা পাওয়া গেল তার হিসেব।

সতীশ চোখ বুলিয়েই বলে উঠলো, এই তো হাতে-হাতে ধরা পড়বার ব্যবস্থা করে রেখেছো এইখানে। কান-কাটা জগা যে গরু হুটো দিয়ে গেল, সেটা তুমি কেটে ফেললেই পারতে!

আলী-সাহেব খাতাটা কেড়ে নিলে সতীশের হাত থেকে। বললে, কাটতে ভুলে গেছি। দাও।

ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারছিলাম না। সতীশকে জিজ্ঞাসা করতেই সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। বললে, জগা যে গরু হুটো দিয়ে গিয়েছিল সে-হুটো আজ ছাড়াতে এসেছিল বদি ময়রা। আলী-সাহেব তার কাছ থেকে একটি পয়সাও নিলে না, একেবারে এমনি খেড়ে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

সতীশ বললে, তুমিই তো বললে, গরু হুটো জগা রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। কারও কোনও ক্ষতি করেনি।

বললাম, তবে যে কাল বললে, আমাদের ও-সব দেখবার দরকার নেই!

কথাটা বলেছিল আলী-সাহেব।

তাকিয়ে দেখি, সে তখন মুখ টিপে টিপে হাসতে।

সতীশ বললে, দেখছো কি? ও-লোকটি অমনি!

লোকটির সত্যকার পরিচয় তখনও আমি পাইনি। ভেবেছিলাম, আমাদের চেয়ে বয়সে বড় এই অশিক্ষিত মুসলমানের ভেতর

আমাদের সমবয়সী ইস্কুলের ছেলেরা এমন কী দেখেছে যার জন্য সবাই এখানে এসে ভীড় করে!

শুধু যে লুকিয়ে পান-বিড়ি খাবার জন্যে আসে না সেকথা পরে বুঝেছিলাম। পরিচয় ক্রমশঃ আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। দেখেছিলাম, সত্যাশ্রয়ী দৃঢ়চেতা অথচ বিনয়-নম্র সদানন্দ একটি সত্যিকার মানুষ!

দেখেছি, গরীব মানুষ, হাতজোড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, বলেছে, গাইটা আপনার খোঁয়াড়ে এসেছে মিঞা-সাহেব, ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার পয়সাটা যোগাড় করে উঠতে পারিনি আজ। কাল নিয়ে যাব।

আলী-সাহেব জিজ্ঞাসা করেছে, তাহলে আজ তুমি এসেছ কি জন্যে?

লোকটি বলেছে, এখানে নাকি গরুগুলোর সেবাযত্ন হয় না, তাই বলতে এসেছি যেন দু'-আঁটি খড় আর এক বালতি জল ওকে দেওয়া হয়।

আলী-সাহেব বলেছে, বয়ে গেছে আমার সেবা-যত্ন করতে। তুমি নিয়ে যাও তোমার গাই!

এই বলে খোঁয়াড়ের তালা খুলে দিয়েছে। নিয়ে যাও।

লোকটা বলেছে, কিন্তু পয়সা--

—পয়সা কে চাইছে তোমার কাছ থেকে? গাইটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাও, নইলে আমার ভাই এক্ষুণি এসে পড়বে।

নজরুলের কাছে যাব বলেই বেরিয়েছিলাম, সতীশ না আটকালে হয়ত এতক্ষণ চলেই যেতাম।

হঠাৎ নজরে পড়লো—ছিনু আসছে। ছুটে বেরিয়ে পড়লাম খোঁয়াড় থেকে।

ছিনুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ছিনু বললে, দুখু মিঞা বাড়ি চলে গেছে।

—চুরুলিয়া গেছে ?

ছিনু বললে, হ্যাঁ, তার ভাই এসেছিল। মায়ের অসুখ, অনেক্‌দিন যায়নি, তাই গেল একবার।

ছিনুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাড়ি ফিরে এলাম। ভাবলাম নজরুল গেছে চুরুলিয়া, এই সময় আমিও একবার অণ্ডাল থেকে ফিরে আসি। অনেক দিন যাইনি।

এখান থেকে মাইল-দশেক দূরে অণ্ডাল গ্রাম। আমার মামার বাড়ি। গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ধরেও যাওয়া যায়, আবার ট্রেনে চড়েও যাওয়া চলে। ট্রেনে তখন ভাড়া ছিল মাত্র চার পয়সা।

পরের দিন রবিবার। সকালের ট্রেনে চলে গেলাম অণ্ডাল।

ভেবেছিলাম, সোমবার এসে ইস্কুল করব।

কিন্তু রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শীত-শীত করতে লাগলো। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙতে দেখি রীতিমত জ্বর। দিদিমাকে বলবার উপায় নেই। হৈ চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। চাপাচুপি দিয়ে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলাম! ভেবেছিলাম, সকালে উঠে কাউকে কিছু না বলেই পালাবো।

কিন্তু পালাবো কি—উঠতেই পারলাম না।

জানাজানি হয়ে গেল।

বুড়ো অনন্ত কোবরেজ এলো দেখতে। হাত দেখলে, পেট দেখলে, চোখ দেখলে দেখেশুনে বলে গেল, বেয়াড়া জ্বর। বেশ দিনকতক ভোগাবে।

সত্যিই ভোগালে।

যত না ভুগলাম জ্বরে তার চেয়ে বেশি ভুগলাম মনের উদ্বেগে। নজরুল তার বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখবে, আমি আর যাই না তার কাছে। কেন যাই না কিছুই জানবে না। হয়ত সে আসবে আমাদের বাড়িতে, হয়তো শুনবে আমি অণ্ডাল এসেছি কিংবা হয়ত ভাল করে কেউ তার সঙ্গে কথাই বলবে না।

ভাত খেলাম পাঁচ-ছ' দিন পরে। ভাবলাম, এবার চলে যাব রাণীগঞ্জে। কিন্তু যেতে দিলেই তো!

থেকে গেলাম।

একমাত্র সান্ত্বনা—ছিনু খুশী হবে। নজরুলকে একখানা চিঠি লিখবো ভাবছিলাম। তাও লিখলাম না।

রাণীগঞ্জে ফিরে এলাম দশ-বারো দিন পরে।

যেদিন এলাম সেইদিনই বিকেলে যাচ্ছিলাম নজরুলের কাছে, খোঁয়াড়-মুন্সির ঘরে বসেছিল সতীশ, আমাকে দেখেই ছুটে বেড়িয়ে এলো।

মনে হলো যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল সে। বললাম, আমার ভাই একটু বিশেষ দরকার আছে। এখন ছাড়ো।

সতীশ বললে, এদিকে তুমি কেন যাচ্ছ তা জানি। যাচ্ছো নজরুল ইসলামের কাছে। একটু পরেই না হয় যেয়ো।

এই বলে সতীশ আমাকে একরকম জোর করে টেনে নিয়ে গেল খোঁয়াড়ের সেই ঘরটার ভেতর। আলী-সাহেব বসে বসে হাসছে। বললে, আজকাল কবরখানার ওদিকটা ঘুরে ঘুরে যাও বোধহয়।

—কোথায়?

—দুখু মিঞার কাছে।

আমি কিছু বলবার আগেই সতীশ বললে, আজকাল ইস্কুল যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে।

বললাম, আমি ছিলাম না এখানে। অণ্ডাল গিয়ে জ্বরে পড়েছিলাম।

সতীশ বললে, যাক আর মিছে কথাটা নাই-বা বললে! নাও খাও। বলে একটা বিড়ি বার করলে।

তার হাতটা সরিয়ে দিলাম।

বিড়ি আমি খেতে চাইনি সেদিন।

সতীশ বললে, সিগ্রেট খাবে? গাঁজা?

খুব রাগ হলো সতীশের ওপর। বললাম, কী যা-তা বকছো! সত্যি বলছি আমার ভাল লাগে না খেতে।

সতীশ বললে, তোমরা গাঁজা খাচ্ছো লুকিয়ে লুকিয়ে আর একটা বিড়ি খেতেই যত দোষ?

একটু জোরেই বললাম, এ-সব কী বলছো?

সতীশ বললে, ঠিকই বলছি। তোমরা—মানে তুমি আর নজরুল গাঁজা খাও।

এই কথার পর অন্য কেউ হলে তক্ষুণি ঝগড়া হয়ে যেতো কিন্তু আমার স্বভাবটাই অন্যরকম।

উঠে দাঁড়ালাম। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

আলী-সাহেব বললে, রাগ করছো ভাই?

বললাম, হ্যাখো, আমি যদি-বা সতীশের পাল্লায় পড়ে বিড়ি সিগ্রেট দু'এক টান টেনেছি, নজরুল আজ পর্যন্ত ছোঁয়নি ও-সব। আর সতীশ বলছে আমরা গাঁজা টানি।

সতীশ বললে, গাঁজা না টানলে ওইরকম কবিতা লিখতে পারে কেউ?

বললাম, কবিতা লিখলেই গাঁজা টানতে হবে?

সতীশ বললে, নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। আমাদের বাড়ির সামনেই যে-গাঁজার দোকান সেখান থেকে আমি নজরুলকে গাঁজা কিনতে দেখেছি। আচ্ছা, এইবার হাতে-নাতে একদিন ধরে দেবো—তাহলে হবে তো?

সেই ভাল। বলেই একরকম ছুটে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। সতীশ আটকাতে পারলে না।

নজরুলের সঙ্গে দেখা হতেই বলে উঠলো, বেশ ছেলে বাবা! ছিনু কি বলেছে না বলেছে আর অমনি রাগ হয়ে গেল? ছিনু! অ ছিনু!

বাইরে থেকে ছিনুর জবাব এলো: শুনেছি। শুনেছি।

দু' কাপ চা হাতে নিয়ে ছিনু ঢুকলো হাসতে হাসতে। বললে, তোমার জন্যে বকুনি খেয়ে খেয়ে মরছিলাম বাবা, তুমি এসে গেছ, বাঁচলাম। নাও, চা খাও। খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও।

ছিনুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বকুনি খাচ্ছিলে কেন ?

—তোমাকে আসতে বারণ করেছিলাম যে।

বললাম, তাও তুমি বলেছো নজরুলকে ?

—বলবো না ? মরছিল যে তোমার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে। আমাকে বলছিল, তুই যা একবার রায়-সাহেবের বাড়ি। আমাকে দেখলে চাকরগুলো ভাল করে কথা বলে না। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। তুমি অণ্ডাল গিয়েছিলে মিঞা-সাহেব ?

বললাম, হ্যাঁ। সেখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলাম।

ছিনু বললে ওই শোনো! আর দুখু আমাকে বলে কিনা আমি তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি। কাজ কি বাবা, আমি আর তোমাদের কোন কথায় নেই।

ছিনু গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল।

নজরুল তার বালিশের তলা থেকে খাতাটা টেনে বের করলে। বললে, দুটো বড় বড় কবিতা শেষ করেছি। শোনো। একটা 'রাজার গড়', অন্যটা 'রাণীর গড়'।

দুটি কবিতাই শুনলাম।

শুনে বলেছিলাম, তুমি আর গদ্য লিখো না। এখন থেকে কবিতাই লিখবে।

ছিনু যে ঘাপ্‌টি মেরে কোথায় দাঁড়িয়েছিল বুঝতে পারিনি। তার সেই হুঁকোটি হাতে নিয়ে কল্‌কেয় ফুঁ দিতে দিতে এসে দাঁড়ালো। বললে, সাধে কি তোমাকে আসতে বারণ করি মিঞা-সাহেব! ওই মন্তরটি দিলে তো ওর কানে! আবার বললে তো পদ্য লিখতে!

নজরুল বলে উঠলো, ছিনু! তুই না বলেছিলি আর কথা বলবি না!

চিনু চুপ করে গেল। তার সেই অসহায় করুণ অবস্থাটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। সে-মুখ আমি আজও ভুলিনি। কল্‌কেটি হুঁকোর মাথায় বসিয়ে ধীরে ধীরে টানতে টানতে বলেছিল, হ্যাঁ, বলেছিলাম।

ব্যস্‌, আর কিছু সে বলতে পারেনি। রাগ করেও না, অভিমানেও না। নীচের দিকে মুখ করে উবু হয়ে বসেছিল মেঝের ওপর। হুঁকোটা পর্যন্ত টানতে পারছিল না।

নজরুল উঠে দাঁড়ালো। আমাকে বললে, চল একটু ঘুরে আসি।

আমিও তাই চাইছিলাম। সতীশের কথাটা তাকে না বলে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

ঘর থেকে বেরুচ্ছি, শুনলাম ছিনু বলছে, আমার আবার কথা! কেই-বা রাখে, আর কেই-বা শোনে!

বোর্ডিং থেকে বেবিয়েই সতীশেব কথাটা নজরুলকে বলেছিলাম। কথাটা নজরুল হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। হো হো করে হেসে বলেছিল, ঠিকই বলেছে সতীশ। গাঁজা আমি খাই। কিছু দিন থেকে খেতে ধরেছি।

বিশ্বাস করতে পারিনি। বলেছিলাম, ধেৎ!

খোঁয়াড়ের সমুখ দিয়ে যাবার রাস্তা। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে-পথে গেলাম না। ডানদিকে ঘুরে গয়লা পাড়ার সরু গলির ভেতর ঢুকে পড়লাম। এঁদো গলির গোলকধাঁধায় ঘুবে ঘুরে বড় রাস্তা ধরলাম খাঁড়গুলির মোড়ে।

বাঁদিকে সতীশের বাড়ি। যদিও জানি, সে তখনও খোঁয়াড়ে বসে আছে, তবু তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে মন চাইছিল না। নজরুল কিন্তু থমকে থামলো। পকেট থেকে দু' আনা পয়সা বের করে সত্যসত্যিই পাশেব গাঁজার দোকানে ঢুকে পড়লো।

পথের ধারে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম হাঁ করে।

গাঁজার মোড়কটি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো নজরুল। বললে, দেখলে ?

তখন মুখ দিয়ে আমার কথা সরছিল না। খানিকটা পথ চুপচাপ গিয়ে বললাম, তাহলে সর্তাশ যা বললে, মিথ্যে নয় ?'

নজরুল বললে, না সত্যি।

তখনও কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

হাসি-রহস্য করতে করতে পথ চলতে লাগলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো চারিদিকে। শহর ছাড়িয়ে তখন আমরা চলছি একটা ডাঙ্গার ওপর দিয়ে। বাঁদিকে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড। ডানদিকে ধানের মাঠ।

বললাম, এবার ফিরি চল রাত হয়ে গেল।

নজরুল বললে, আর-একটু। ওই যে গাছের তলায় একটা আলো দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকেই ফিরব।

দেখলাম, অনেকদিনের পুরনো একটা বটগাছের তলায় মোটা মোটা কাঠের ধুনি জ্বালিয়ে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। আর এক ভক্ত চেলা বসে বসে তাঁর পা টিপছে।

নজরুল তার পকেট থেকে গাঁজার প্যাকেটটি বের করে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে।

এতক্ষণে বুঝলাম তার গাঁজার রহস্য। মন থেকে একটা গুরুভার বোঝা নেমে গেল।

নজরুল চোখ টিপে আমার হাতে একটা চিমটি কেটে ইশারায় কি যে বললে ঠিক বুঝতে পারলাম না। হাতের জ্বালা সামলাতে সামলাতে হাঁ করে তাকিয়েছিলাম সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসী চোখ পিট্ পিট্ করে এক-একবার তাকাচ্ছেন, আবার চোখ বুজলেন।

নজরুল এক সময় আমার কানে-কানে বললে, প্রণাম কর!

প্রণাম তো করবো, কিন্তু আমার সে প্রণাম দেখবে কে ? প্রভুর তো চোখ বন্ধ!

প্রণাম একটা করলাম শেষ পর্যন্ত!

চোখ না হয় বন্ধ, কিন্তু কান তো বন্ধ নয়। নজরুল হাতজোড় করে বললে, আমার ব্যাপারটা কি হবে বাবা? কখন বলবেন?

বাবা শুনেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বাবা নির্বিকার।

'বাবা' 'বাবা' বলে ডেকে ডেকে নজরুল হয়রান হয়ে গেল, বাবা চোখ আর খোলেন না!

আগে যদি-বা এক-আধবার চোখ পিট্ পিট্ করছিলেন, এখন আবার তাও করছেন না।

অন্ধকার রাস্তা। আমাদের ফিরে যেতে হবে অতটা পথ। নজরুলকে চুপি চুপি বললাম, কাল না-হয় সকাল-সকাল আসা যাবে, আজ চল।

নজরুল বোধ করি শেষ চেষ্টা করলে। আবার ডাকলে, বাবা!

নজরুলের ভাগ্য বুঝি হঠাৎ প্রসন্ন হলো। বাবা নড়ে চড়ে বসলেন। চোখ চেয়ে একবার তাকালেন আমাদের দিকে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তক্ষুণি সেই লাল লাল ছোট চোখদুটি আবার বন্ধ হয়ে গেল। ধরা-ধরা গলায় বললেন, বাবুলাল, ছিলুম বনাও!

বাবুলাল বোধ করি চেলাটির নাম। বাবুলাল পা ছেড়ে দিয়ে নজরুলের দেওয়া গাঁজার মোড়কটি নিয়ে তার কাজ আরম্ভ করলে।

নজরুল আর কত ডাকবে! আমাকে বললে, দাঁড়াও আর-একটু দেখি।

ওদিকে বাবুলাল তার কাজ শেষ করে কল্‌কের ওপর ধুনি থেকে বেছে বেছে কয়েকটি আগুনের টুকরো তুলে নিয়ে চীৎকার করে উঠলো, ব্যোম শঙ্কর!

বাবাকে এবার আর ডাকবার প্রয়োজন হলো না। হাত বাড়িয়ে কল্‌কেটি নিয়ে বাবা প্রাণপণে বারকতক টানলেন, তারপর

সেটি আবার বাবুলালের হাতে ফেরত দিয়ে নজরুলের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

হাসতে হাসতেই বললেন, নেহি নেহি বেটা, উও বিলকুল ঝুট্ হ্যায়। উহা কুছ্ নেহি।

নজরুল তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে বলে মনে হলো।

কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কি তার প্রশ্ন জানি না। এখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করাও যায় না।

নজরুল এবার ওঠবার জন্যে প্রস্তুত। আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে, চল।

আমিই উঠতে চাইলাম না। নজরুলকে বললাম, ছাখো।

গাঁজার কল্‌কেটি তখন বাবুলালের হাতে। সে তখন তার গুরুজীর প্রসাদ পাচ্ছে।

ধূমপান অনেক দেখেছি, কিন্তু সেরকম ধূমপান আমি আর কখনও দেখিনি। সেরকমটি দেখবার সৌভাগ্য আমার আজও হলো না। কি নিষ্ঠা! কি ভক্তি! সবার আগে কল্‌কেটি দু'হাত দিয়ে ধরে চোখদুটি বন্ধ করে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগলো। তারপর কলকেটি কপালে ঠেকিয়ে মারলে টান। সে কী টান! ইঞ্জিনের একটান হুইসলের মত একরকম শব্দ হলো, গলার রগ আর শিরাগুলো ফুলে মোটা হয়ে উঠলো, সারা মুখখানা হলো সিঁদুরের মত লাল, রোগা খিটখিটে লম্বা মানুষটি টানের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উচু হলো, তারপর দম ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুন যেমন করে চুপ্‌সে যায়, তেমনি করে থপাস্ করে বসে পড়লো, বাবুলালের ধূম্র সেবনের সে কী অপরূপ ভঙ্গী!

তারপর বহুক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে ধূম্র ভক্ষণ!

ঠোঁটে আর জিবে একরকম শব্দ করে কোঁৎ করে কি যেন গেলে, আবার শব্দ করে, আবার গেলে। চলতেই থাকে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপরূপ লীলা দেখছি, উঠতে পারছি না কিছুতেই, আর চাপা হাসিতে আমারও সর্বাঙ্গ তখন বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হাসি চাপতে গিয়ে নজরুল একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসলো।

মুখে হাত চাপা দিয়ে খুঁক খুঁক করে একরকম শব্দ করতে করতে সেখান থেকে উঠে পালাচ্ছে, একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো গিয়ে একটি মেয়ের গায়ের ওপর।

মেয়েটি আসছিল সন্ন্যাসীর কাছে। তার সঙ্গে আসছিল লণ্ঠন হাতে নিয়ে একজন লোক।

মুহূর্তে লোকটা হৈ হৈ করে চীৎকার করে উঠলো।

ওদিকে বাবার তখন যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেছে। তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কেয়া হুয়া ?

আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আমি, আর বুঝতে পারছে আমাদের বাবুলাল।

কি আর করি, উঠে দাঁড়ালাম।

ভেবেছিলাম, ভদ্রমহিলা নজরুলকে কিছু বলবে, কিন্তু বলা দূরে থাক, নজরুলের মুখের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলো, কে রে, আমাদের দুখু না ? তুই এখানে কি করছিস ?

নজরুল লজ্জায় এতক্ষণ মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি। এতক্ষণ পরে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললে, হ্যাঁ আমি—এখানে এই বাবার কাছে—মাকে—

মেয়েটি বললে, যাস একদিন আমাদের বাড়ি। বাড়ি চিনিস তো ? অর্জুনপটির কুয়োটার কাছেই। ওই তো, শৈল জানে।

আরে, আমাকেও চেনে দেখছি ! আমি কিন্তু তাকে চিনতে

পারিনি। আমি হাঁ করে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে-ছিলাম।

—কিরে, আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি যতীনের দিদি।

যতীন আমার সহপাঠী। অন্তরঙ্গ বন্ধু। জাতে ক্রিশ্চান। তার দিদি এসেছে এই সাধুর কাছে।

'যাব।' বলে সেখান থেকে চলে এলাম।

পথে আসতে আসতে নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, যতীনের দিদি তোমাকে চিনলে কেমন করে?

নজরুল প্রথমে বলতে চাইছিল না। বললে, সে অনেক কথা।

আমি তাকে কিছুতেই ছাড়লাম না। বললাম, হোক না অনেক কথা। রাস্তাও তো অনেকখানি, অনেক কথাও শেষ হয়ে যাবে [illegible] যেতে।

কথা কিন্তু অনেক মোটেই নয়।

নজরুল বললে, তুমি তো জানো, কিছুদিন আমি কাজ করেছিলাম।

—কি কাজ?

নজরুল বললে, ছোট কাজ। বাবুর্চির কাজ, খানসামার কাজ,······

বললাম, জানি।

নজরুল বললে, এক গার্ড সাহেবের কাছে কিছুদিন কাজ করেছিলাম জানো?

—জানি।

—এই মেয়েটিই সেই গার্ড সাহেবের স্ত্রী।

চুপ করে কি যেন ভাবছিলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে নজরুল বললে, এখন বুঝলে তো—কেমন করে এই মেয়েটি আমাকে চিনলে?

—বুঝলাম। তবে যে বলছিলে অনেক কথা!

নজরুল আর কিছু বললে না। চুপ করে রইলো।

বুঝলাম, কথাটা সামান্যই, কিন্তু সেই সামান্য কথা নজরুলের কাছে আজ অসামান্য হয়ে উঠেছে।

ভাবছিলাম, যতীনের দিদি ক্রিশ্চান, হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে সে গেল কিসের জন্যে ?

জিজ্ঞেস করতে নজরুলও বলতে পারলে না।

পাঁচ:

যতীন আর আমি পড়ি একই ক্লাশে, কিন্তু আমাদের সেকশন আলাদা। ক্লাশে ছাত্রসংখ্যা অনেক। এক ঘরে ধরে না। তাই সেক্শন 'এর' ছাত্রেরা বসে দোতলায়, 'বি'র ছাত্রেরা নীচে। যতীন বসে 'বি' সেকশনে। ছুটির আগে আর দেখা হয় না।

ছুটির পর একদিন দেখি, যতীন গেটের পাশে দাঁড়িয়ে।

কাছে যেতেই বললে, তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আজকাল তোর নতুন বন্ধু জুটেছে। তোর সঙ্গে দেখাই হয় না।

কথাটা মিথ্যে নয়। নতুন বন্ধু মানে নজরুল।

বললাম, কি কথা বলতে ভুলে গেছিস তাই বল্।

যতীন বললে, দিদি একদিন তোকে যেতে বলেছিল।

এক রাস্তা ধরেই দু'জনের বাড়ি যেতে হয়।

চলতে চলতে বললাম, দিদি আমাকে ঠিক চিনেছে। কিন্তু কেমন করে যতীন? আমি তোর দিদিকে সেদিন প্রথম দেখলাম।

যতীন বললে, তুই দেখিসনি, হয়ত দিদি দেখেছে।

তা হবে। আগে প্রায় রোজই যেতাম যতীনের বাড়ি। জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কি জন্যে গিয়েছিল রে ওখানে—ওই সন্ন্যাসীর কাছে?

সঙ্গে সঙ্গে যতীন বললে, জানি না। তারপর পথ চলতে চলতে হঠাৎ তার কি মনে হলো কে জানে, বললে, বলতে পারি দিদি যদি কোনদিন না জানতে পাবে।

যতীনের গা ছুঁয়ে প্রতীজ্ঞা করেছিলাম। বলেছিলাম, জানতে পারবে না, তুই বল্। যতীন তখন চুপি চুপি বলেছিল, দিদির সংসারে সুখ নেই। শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসতে চায়।

—তা সন্ন্যাসী কি করবে?

যতীন বলেছিল, নগেন ময়রার কাছে আমি শুনেছিলাম, চকমকির মাঠে এক সাধু এসেছে, সে নাকি সব অসাধ্য সাধন করছে। সেই কথা দিদিকে বলেছিলাম। দিদি প্রথমে বিশ্বাস করেনি। তখন আমি নিজে গিয়ে একদিন সন্ন্যাসীর লোকটাকে ডেকে এনেছিলাম। সে এসে বলেছিল, সাধুবাবার জন্যে কিছু গাঁজা আর পাঁচটি টাকা নিয়ে যাবেন মা, বাবার কাছ থেকে আমি কিছু মন্ত্র-দেওয়া ভস্ম চেয়ে আপনাকে দেবো। সেই ভস্ম আপনি আপনার স্বামীর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন, তারপর দেখবেন মজা। আপনাদের ছাড়াছাড়ি যদি না হয় তো আমাকে পাঁচ জুতো মারবেন। তাই এক টাকার গাঁজা আর পাঁচটি টাকা নিয়ে দিদি গিয়েছিল সেদিন।

শুনলাম সেই মন্ত্র-দেওয়া ভস্ম নাকি দিদি সেদিন নিয়ে এসেছে।

রাস্তার ধারেই একতলা বাড়ি যতীনদের। কতদিন গেছি সেখানে। জানতাম যতীনের এক দিদি আছে, আর একটি বোন আছে যতীনের চেয়ে ছোট, কিন্তু কোনদিন তাদের আমি চোখে দেখিনি। সেদিন দিদিকে প্রথম দেখলাম চকমকির মাঠে।

দোরের কড়া নাড়তেই চাকর এসে দোর খুলে দিলে। ছোট ছোট অনেকগুলি মুরগীর বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমাদেব দেখেই ছুটে পালালো।

সুমুখের ঘরখানিই যতীনের ঘব। পুরনো ভাড়াটে বাড়ি। কিন্তু এমনি পরিপাটি করে সাজানো, পুরনো বলে মনেই হয় না। দরজায় জানালায় পর্দা খাটানো, টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি—সব-কিছু একেবারে নতুনের মত ঝকঝক করছে।

ঘরে ঢুকেই বললাম, ডাক দিদিকে!

যতীন আমার কথাটার জবাব দিলে না। বইখাতা রেখে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ভাবলাম দিদিকে ডাকতে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোতে যে-দিদিকে দেখেছি অপরূপ সুন্দরী, আজ সেই

দিদিকে দেখবো দিনের আলোয়। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করচি দোরের দিকে তাকিয়ে।

খানিক পরে ইয়াসিন এলো। হাতে চা আর একটা গরম আলুর চপ।

জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কোথায় ইয়াসিন?

ইয়াসিন বললে, দিদিমণি তো এখানে নেই বাবু।

সেকি? তবে যে যতীন বললে—

ইয়াসিন আমার দিকে তাকাল।

কি বললে যতীন? বলতে বলতে যতীন ঘরে ঢুকলো।

বললাম, দিদি এখানে নেই?

যতীন বললে, না। চারদিন আগে চলে গেছে প্রসাদপুরে।

—তবে যে বললি, দিদি আমাকে ডেকেছে!

—যাবার আগে ডেকেছিল। বললাম তো তোকে বলতে ভুলে গেছি।

বললাম, কই, আগে তো সেকথা বললি না?

যতীন বললে, বললে কি করতিস?

কিন্তু মনটা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেল।

যতীন বললে, আসছে রবিবার আমি যাব দিদির কাছে। তুই যেতে পারিস আমার সঙ্গে।

সোম মঙ্গল দু'দিন কিসের যেন ছুটি ছিল। বললাম, যাব।

যতীন বললে, সকালে আসিস আমাদের বাড়িতে। সাতটায় ট্রেন! এক সঙ্গে চলে যাব।

সেই কথাই রইলো। রবিবার সকালে যতীনের সঙ্গে আমি প্রসাদপুর যাব।

সঙ্গে যদি নিয়ে যেতে পারি নজরুলকে তাহলে বেশ মজা হয়। বললাম গিয়ে নজরুলকে। তোমাকে যেতেই হবে।

নজরুল রাজি হয় না কিছুতেই। নানারকমের ওজর-আপত্তি।

কখনও অ্যাল্‌জেবরাটা দেখিয়ে বলে, এই ছাখো, এই এতগুলো হোমটাস্ক। এখনও ইংরেজীতে তিনটে 'এসে' লিখতে হবে ছুটিতে। 'হোম্‌ টাস্ক্‌' এই এ-তো!

বুঝলাম, সব বাজে কথা! যাবার ইচ্ছা নেই!

বাধ্য হয়ে আমাকে একাই যেতে হলো।

ভাগ্যিস একা গিয়েছিলাম! সেখানে গিয়ে বুঝলাম সেকথা!

জংশন-স্টেশন থেকে সামান্য পথ! মাত্র মাইলখানেক।

আজকাল মোটর-বাস, সাইকেল-রিক্সা, কতরকমের কত যান-বাহন, যেখানে যাবেন পৌঁছে দেবে. পকেটে পয়সা থাকলেই হলো। কিন্তু তখনকার দিনে ষ্টেশনটাও এত বড় ছিল না, এত গাড়ি-ঘোড়াও ছিল না, লোকজন সব পায়ে হেঁটেই যাওয়া আসা করতো।

ট্রেন থেকে নেমে গল্প করতে করতে যতীন আর আমি কখন যে প্রসাদপুরে পৌঁছে গেছি বুঝতেই পারিনি।

দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। লোকালয় থেকে দূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চমৎকার একটি বাংলো-বাড়ি। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। চারিদিকে বড় বড় আম আর অর্জ্জুনের গাছ।

জায়গাটা যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম। হাওয়া এসে লাগছে গাছের ডালে। কত রকমের কত পাখির বিচিত্র ডাক শোনা যাচ্ছে।

কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গায়-ভরা এই কয়লাকুঠির দেশ। ফুল এখানে খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে—বাড়িটার সামনে গেটের কাছাকাছি যেতেই ফুলের সমারোহ দেখে থমকে থামতে হলো। দেখলাম, সুমুখের অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান, আর সেই বাগান আলো করে ফুটে আছে বড় বড় গাঁদা আর ডালিয়া।

—কিরে, তোরা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয়!

মুখ ফিরিয়ে দেখি, দিদি এসে দাঁড়িয়েছে। এলো চুল পিঠের ওপর ফাঁস দিয়ে বাঁধা। পরনের শাড়িটা আঁটসাঁট করে কোমরে জড়ানো।

দিদিকে দেখলাম।

সেদিন চকমকির ডাঙ্গার সেই বড় বটগাছের তলায় সন্ন্যাসীর আস্তানায় যাকে দেখেছিলাম, এ যেন সে-মেয়ে নয়।

বললাম, ফুল দেখছি।

দিদি বললে, পরে দেখবি। আয়!

কাছে যেতেই বললে, সারাদিন একা-একা কি আর করবো, একটা মালি রেখে ওই-সব করেছি।

মনে হলো দিদি যেন কাজ করতে করতে উঠে এসেছে।

অনুমান মিথ্যে নয়।

বললে, তোদের জন্যে রান্না করছিলাম।

বললাম, আমরা আসবো জানলেন কেমন করে?

—যতীন চিঠি লিখেছিল। দুখুকে আনতে পারলে না?

বললাম, এলো না।

দিদি বললে, জানি—ও আসবে না।

বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। প্রতিটি ঘর এমনভাবে সাজানো, দেখলে মনে হয় মস্ত বড়লোকের বাড়ি। যে-ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালে সে-ঘরে ধুলোমাখা জুতো পায়ে দিয়ে বসতে আমার কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছিল।

দিদি আমার কাছে এগিয়ে এলো। বললে, তুমি এসেছ, আমার এত আনন্দ হচ্ছে! বোসো, তোমাদের আগে চা খাওয়াই।

দিদি বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। যতীন বললে, রান্না করছিলে কেন? যোসেফ নেই?

দিদি বললে, থাকবে না কেন—আছে। যোসেফ্ আছে, কালীচরণ আছে, আমি তাদের দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। আজ তো আবার তিনি আসবেন।

যতীন জিজ্ঞাসা করলে, কখন ?

—তার কি কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে ? দুখু যখন ছিল, ঠিক সময়ে টেনে আনতো। বলেই দিদি ঘব থেকে চলে গেল।

যতীনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কার কথা হচ্ছে ?

যতীন বললে, জামাইবাবুব কথা।

যাক, তাহলে দেখা হবে সেই মানুষটিব সঙ্গে !

বাড়িতে ঢুকে অবধি কানে আসছিল পিয়ানোর আওয়াজ। মনে হচ্ছিল, কাছাকাছি কোনও ঘবে বসে কে যেন টং টং করে পিয়ানো বাজাচ্ছে। মুখ হাত ধুতে গিয়ে একটা ঘবের দিকে তাকিয়ে দেখি, পিয়ানোর সামনে পিছন ফিরে বসে আছে একটি মেযে। মুখখানা না দেখা গেলেও বুঝতে দেরি হলো না মেয়েটি ইংবেজ।

একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছি, কিন্তু যতীন আমাকে সেখানে দাঁড়াতে দিলে না। তাড়াতাড়ি টেনে নিযে চলে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, এ মেয়েটি কে ?

বললে, পরে বলবো।

খাবার জন্য আলাদা ঘব। ঘরের মাঝখানে মার্বেল পাথবেব টেবিল, চাবিদিকে চেয়ার। ওইখানেই ওবা খায়। কিন্তু শুধু আমার জন্যে কিনা জানি না, সেদিন দেখলাম, মেঝেব ওপব আসন বিছিয়ে দিদি আমাদের বসে বসে খাওয়ালে। সে আদর, সে যত্ন কোনদিনই ভুলব না।

আমারও ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, একটুখানি স্নেহ ভালবাসার ছোঁয়া পেয়ে ভাবপ্রবণ মন গলে জল হযে গেল। যতীনের দিদি মনে হলো যেন আমারও দিদি।

দিদিও বলল, একটা ভাই ছিল, আজ মনে হচ্ছে যেন দুটো হলো।

সেকথা দিদি তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল !

যতীনের মত আমিও তার ভাই হয়ে গিয়েছিলাম। আজ আর ইহজগতে তাদের কোথাও খুঁজে পাব না। যতীনও নেই, দিদিও নেই। কিন্তু এই দুটি মানুষের অবিচ্ছিন্ন সংস্পর্শে আমি যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলাম, আজও আমার কাছে তা অম্লান হয়ে আছে।

নজরুলের খবর নিতে গিয়ে আমি পেলাম এই দিদিকে। শুধু দিদির কথা নিয়েই বিরাট একটা উপন্যাস লেখা চলে। অসামান্য রূপ আর গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল এই নারী। কি বিচিত্র অদ্ভুত তার জীবনের কাহিনী। সময় পাই তো একদিন বলবো সেকথা।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দিদির ঘরে গিয়ে বসলাম। যতীন শুয়ে পড়লো দিদির খাটের ওপর। আমি বসে বসে একখানা বই পড়ছিলাম। দিদি খেয়ে এসে বললে, আজ আর তোমাদের যেতে দিচ্ছি না। তুমিও শুয়ে পড়।

দিনে ঘুমান অভ্যাস নেই। বললাম, দিনে আমি ঘুমোই না।

যতীনের নাক ডেকে উঠলো। দিদি বললে, ওমা, যতীন ঘুমিয়ে পড়লো! ঘুমোক।

বলেই দিদি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যে-কথা জানবার জন্যে আমি এখানে এসেছি সে-কথা জিজ্ঞাসা করবো কখন? মনে হল, এই তার উপযুক্ত সুযোগ। ডাকলাম, দিদি!

দোরের কাছে ফিরে দাঁড়ালো দিদি।--কি রে?

বললাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে?

—আপনি আপনি করিসনে বাপু, নে কি বলবি বল!

হাসতে হাসতে দিদি তার খাটের ওপর চেপে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, নজরুল—মানে তোমাদের দুখু, কি করতো এখানে?

দিদি সেকথার জবাব না দিয়ে আমাকেই পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, ও আজকাল ইস্কুলে পড়ছে, না?

বললাম, হ্যাঁ, খুব ভাল ছেলে। ডবল প্রমোশন পেয়ে দুটো ক্লাশ ডিঙিয়ে একবারে আমাদের জুড়ি ধরেছে। এখন সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে।•

—ও তো শিয়াড়শোলে, আর তোরা ?

—রাণীগঞ্জে।

—তোর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে বুঝি ?

বললাম, হ্যাঁ। ওদের বোর্ডিং আমাদের বাগানের পাশেই। কি সুন্দর কবিতা লেখে দিদি, তুমি যখন যাবে রাণীগঞ্জে, তখন শোনাবো।

দিদি বললে, গানও গাইতে পারে।

বললাম, হ্যাঁ, নিজেই লেখে, নিজেই গায়।

দিদি বললে, গান প্রথমে সে গাইতে চাইতো না। গাইতে বললেই লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে থাকতো। বলতো, আমার গলা ভাল নয়। তারপর লজ্জা যখন ভেঙে গেল, তখন আর থামতে চাইতো না। ভাবি সুন্দর গায় রে !

কিন্তু যে কথাটি আমি জানতে চাই, সেটা যে দিদি বলতে চাইছে না কিছুতেই। যতবার জিজ্ঞাসা করি, ততবারই অন্য কথা বলে চাপা দেয়।

জানবার এইটেই উপযুক্ত সময়। যতীন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, দিদির হাতে কোনও কাজ নেই, জামাইবাবু এলে হয়ত কথাই বলতে পারবো না। তাই আবার আমি দিদিকে বললাম, বল না দিদি, নজরুল কেমন করে এখানে এসেছিল আর চলেই বা গেল কেন ?

দিদি বললে, ও কি ওই ছোট কাজ করবার জন্যে জন্মেছে ? আর আমরাই বা রাখবো কেন ?

তারপর অনেক কষ্টে দিদির কাছ থেকে আমি যেটুকু জেনেছিলাম তা এই ঃ

দিদির স্বামী ব্র্যাঞ্চ লাইনের গার্ড সাহেব, গাড়ি নিয়ে ডিউটিতে বেরিয়েছেন। শীতকালের রাত্রি। গাড়ি দাঁড়ালো গিয়ে একটা ষ্টেশনে। কয়লাকুঠির দেশ। পর পর কয়লা-ভর্তি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সাইডিং-লাইনের ওপর। সেগুলো টেনে এনে একে একে জুড়তে হবে গাড়ির সঙ্গে। তারপর গাড়ি ছাড়বে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে চুপচাপ।

লাইনের পাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা আম-কাঁঠালের বাগান। সেই বাগানেই একটা গাছের নিচে চট বিছিয়ে কতকগুলো লোক গানের আসর জমিয়েছে। হারমোনিয়াম বাজছে, ঢোল বাজছে, ঝুমুরের সুরে কবি গান হচ্ছে। মন্দ লাগছে না শুনতে। গার্ড সাহেব তাঁর কামরা থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন সেইদিকে।

গোটাকতক লণ্ঠন জ্বলছে টিম টিম করে, আর দু'দিকে দুটো কাঁচা কয়লার গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একটা অর্জুন গাছে হেলান দিয়ে গার্ড সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন। দেখলেন, দলের মাঝখানে বসে জোয়ান যে ছেলেটি ঢোলক বাজিয়ে গান গাইছে, তারই কৃতিত্ব যেন সবচেয়ে বেশি। মাথায় ছোট ছোট চুল, গায়ে একটা হাতকাটা জামা, পরনে খাটো ধুতি। হাসি যেন মুখে তার সব সময় জড়িয়ে আছে।

দুটো গান শেষ হলো। ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। বললে, চললাম।

সবাই আবার তাকে ধরে বসলো, আর-একটু থাকো। ছেলেটি থাকলো না। পেরিয়ে যাচ্ছিল গার্ড-সাহেবের পাশ দিয়ে। গার্ড সাহেব তার হাতটা চেপে ধরলেন। ছেলেটি হকচকিয়ে থমকে দাঁড়ালো। মাথাটা একটু তুলিয়ে মুখ ফিরিয়ে সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বড় বড় ঢলঢলে চোখ, চওড়া বুকের ছাতি!

দেখে মনে হলো ছেলেটি রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সাহেব-ভীতি থাকা তখনকার দিনে ত অস্বাভাবিক নয়। যদিও গার্ড-সাহেবের গায়ের রং দেখলে সাহেব-সাহেব মনে হয় না।

সাহেব বললেন, তুমি এ-দলের নও তাহলে?

—না।

—কি নাম তোমার?

—দুখু মিঞা, ভাল নাম—নজরুল ইসলাম।

—তুমি মুসলমান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাহেব তার বুকে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, বাঃ।

বাসুদেব হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে ব্যাপারটা। দুখুকে সাহেব ধরেছে। মানুষকে বাঘে ধরলেও মানুষ বোধ হয় এত বিচলিত হয় না! আসর ছেড়ে ছুটে এলো বুড়ো বাসুদেব। সাহেবের কাছে এসে জোড় হাতে বললে, দল আমার হুজুর, ও শুধু গান লেখে, পালা লেখে, আর সুর দিয়ে দেয়। যা বলতে হয় আমাকে বলুন। আমরা তো রেলের বাউণ্ডারী ছেড়ে বেশ দূরে বসেচি হুজুর।

বাসুদেব ভেবেছিল বুঝি কোনও বে-আইনী কাজ তারা করে ফেলেছে, যার জন্য সাহেব ধরেছে দুখু মিঞাকে।

সাহেবের বেশ মজা লাগলো। বললেন, তা গাঁ ছেড়ে এসে এতদূরে আসর বসালে কেন?

বাসুদেব বললে, গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো ভারি গোলমাল করে হুজুর। আর এ-জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। তবে সত্যি কথাটা বলি হুজুর আপনার কাছে, শুনুন। মদনের দোকান-ঘরের পাশে যে টিনের চালা-ঘরটা আছে, ওইখানে আমরা আসর বসাচ্ছিলাম। বেশ চলছিল। মদন মাঝে-মাঝে বলছিল বটে—তোমরা অন্য

কোথাও জায়গা ছাখো ভাই, আমার বৌ-বেটি ঘরের কাজ-কর্ম ছেড়ে তোমাদের গান শুনতে বসে যায়, রাত্তিরে ভাল করে রান্না পর্যন্ত করে না। কথাটা আমি গ্রাহ্যই করিনি। কিন্তু পরশু হলো কি, মদনের বড় মেয়েটা দু-খিলি পান আমাদের এই দুখু মিঞার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে কিনা, এসো দুখু, মোড়ল-পুকুরের ঘাটে বসে আমাকে তোমার সেই গানটা শিখিয়ে দেবে। ব্যাপারটা মদন দেখে ফেললে। বাস্, তাই না দেখে মেয়েটাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে লাগালে বেধড়ক্ মার। আপনিই বলুন, এর পর আর আমরা সেখানে যেতে পারি? অথচ দু'-দুটো বায়না, মহড়া না দিলেই নয়। তাই নিরিবিলি এইখানে এসে বসেছি হুজুর। আপনি একটু হুকুম দিয়ে দিন। আজকের দিনটা আর কালকের দিনটা। ব্যস্ তারপর আমরা অন্য জাযগা দেখে নেবো।

রেল-লাইন ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে বাগানে বসে গান গাইছে তারা। হুকুমের প্রয়োজন নেই। তবু গার্ড সাহেব বললেন, আচ্ছা যাও হুকুম দিলাম। কিন্তু তুমি এসো আমার সঙ্গে।

এই-না বলে নজরুলকে নিয়ে গার্ড সাহেব তাঁর ট্রেনের কামরায় এসে উঠলেন। বললেন, এই যে তুমি ওদের কাজ করে দাও এর জন্যে ওরা তোমাকে কি দেয়?

নজরুলের মুখে আবার সেই হাসি। —দেবে আবার কি? শখের দল তো! এমনি।

তোমার বাড়ির অবস্থা বুঝি খুব ভাল।

মাথা হেঁট করে ঘাড় নেড়ে নজরুল বললে, না।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কাজকর্ম্ম কিছু করবে?

নজরুল বললে, পেলে তো করি। দিন-না একটা।

সাহেব বললেন, আমার সঙ্গে থাকতে হবে।

—থাকবো।

—গান শোনাতে হবে।

—বেশ, শোনাব।

ব্যস্। সেইদিনই কাজ পেয়ে গেল নজরুল। রাত্রে বাড়ি পর্যন্ত গেল না। বাসুদেবকে বলে দিলে, মাকে বলে দিও, আমি একটা কাজ পেয়েছি।

চমৎকার কাজ। রেল-ষ্টেশন থেকে প্রসাদপুরের বাংলো মাত্র দেড় মাইল পথ। এই দেড় মাইল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে গার্ড সাহেবকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। এই হলো প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ—টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভর্তি করে প্রসাদপুর থেকে ষ্টেশনে নিয়ে আসা। তৃতীয় কাজ একদিন অন্তর ট্রেনে চড়ে আসানসোল যাওয়া আর সেখান থেকে বিলিতি মদ কিনে আনা।

আর একটি কাজ তার ছিল। গার্ড সাহেবকে গান শোনানো। সে কাজ করবার সময় অবশ্য তার ছিল প্রচুর, কিন্তু গার্ড সাহেবের অবসর ছিল না শোনবার।

তবু এক-একদিন নেশার ঝোঁকে সাহেব বলতেন, শোনাও দেখি তোমার একখানা গান!

গান তো সে গাইতেই চায়, কিন্তু বাজাবার যন্ত্র?

যন্ত্র আছে প্রসাদপুরের বাংলোয়। হারমোনিয়াম আছে, পিয়ানো আছে।

সাহেব বলেছিলেন, তাহলে প্রসাদপুরে গিয়ে তোমার গান শুনতে হবে নাকি?

গাইতে যখন বলেছেন, তখন গাইতেই হবে।

বুক বাজিয়ে টেবিল বাজিয়ে নজরুল শোনাতো তার গান। কিন্তু নাঃ, এরকম করে গান গেয়ে সুখ নেই, শুনেও সুখ নেই।

সাহেব কিন্তু তাইতেই ভারী খুশী!

নজরুলকে তখন তিনি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছেন। বলতেন, ভাল করে বাজনা বাজিয়ে মেম-সাহেবকে একদিন শুনিয়ো তোমার গান। আমিও শুনবো সেইদিন।

একদিন কেন, মেম-সাহেব অনেক দিন শুনেছে তার গান। কিন্তু প্রসাদপুরের বাংলোয় প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাহেবকে পাওয়া গেল না কোনদিন, কাজেই বাজনার সঙ্গে নজরুলের গান তাঁর আর শোনাও হল না।

রেলের ফিরিঙ্গী কর্মচারীদের জন্যে কয়েকটি বাংলো ছিল জংশন ষ্টেশনের এক ধারে। তাদেরই একটিতে থাকতো এক আধবুড়ো সাহেব, আর তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। আর এইখানেই ছিল গার্ড সাহেবের আড্ডা। রেলের ডিউটি শেষ হবামাত্র সাহেব এক-রকম ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হতেন এই বাংলোর ফটকে। ডাকতেন, পল!

ডাকবামাত্র ভেতর থেকে শোনা যেতো, কাম ইন।

বাংলোর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতো হয় পল, নয় তার তরুণী স্ত্রী নোরা।

নোরা আলু ভেজে ডিম ভেজে কোনদিন-বা মাংস রান্না করে টেবিল সাজিয়ে বসে থাকতো। গার্ড সাহেব গিয়ে বসতেন তাদের সঙ্গে। তারপর তাঁর চামড়ার সুটকেশটি খুলে বের করতেন আসল বিলেতী মদের বোতল। শুরু হতো তাদের মদ্যপান।

নোরা সামান্য একটু খেয়েই উঠে পড়তো। পল অবশ্য তার চেয়ে একটু বেশি খেতো, কিন্তু আমাদের গার্ড সাহেবের খাওয়া আর শেষ হতে চাইতো না। একাই বসে বসে পেগের পর পেগ চালিয়ে যেতেন।

এখন যদি-বা একটু সংযত হয়েছেন, আগেকার দিনে কারও নিষেধ বারণ তিনি কানেই করতেন না। যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন, ততক্ষণ সমানে চলতো তাঁর মদ্যপান। পল ও নোরা এক-একদিন ভারি বিপদে পড়তো। দু'জনে অতি কষ্টে ধরাধরি করে তাঁর সেই বিরাট বপুকে তুলে নিয়ে

গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত। সকালে ঘুম ভাঙতেই দিব্যি ভাল মানুষটির মত মুখ হাত ধুয়ে এক কাপ চায়ের জন্যে টেবিলের ধারে চুপটি করে বসে থাকতেন। যেন কিছুই করেন নি। কিছুই জানেন না।

নোরা নিজের হাতে চা তৈরি করে এনে এক-একদিন জিজ্ঞাসা করতো, আচ্ছা মিষ্টার গোস্, এই রকম করে মদ খেয়ে তুমি কি আনন্দ পাও?

গার্ড সাহেব বলতেন, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না নোরা, বলতে পারবো না।

নোরা অবশ্য কিছু কিছু জানতো।

গার্ড সাহেবেরা চার পুরুষ ধরে ক্রিশ্চান। তবু তাদের বংশের কেউ কোনদিন একটা ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে ঘরে আনে নি। খাস ইংরেজ না হোক অন্তত পক্ষে ফর্সা একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েও যদি আসতো তো গায়ের চামড়াটা তাদের এমন কালো হতো না। তাই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—বিয়ে যদি করতে হয় তো মেম বিয়ে করবেন। তাঁর পিতামহেব ছিল বিরাট কাঠের কারবার। মৃত্যুর পর তাঁর সেই কারবার সমেত প্রচুর ধনসম্পত্তি রেখে যান তাঁর একমাত্র ছেলের জন্যে। গার্ড সাহেবের বাবা ছিলেন কিন্তু অন্য ধরনের মানুষ। কারবার তিনি চালাতে পারলেন না। নগদ টাকা নিয়ে বেচে দিলেন এক চীনা ভদ্র-লোককে। বাপের মৃত্যুর পর গার্ড সাহেবের হাতে এলো অনেক টাকা। তখন তিনি যুবক। দামী দামী সুট পরেন, রেল কোম্পানীর ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বখাটে ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে আড্ডা মারেন, আর নিজের গায়ের কালো রংটার জন্যে মাঝে মাঝে আফসোস করেন। দুটো জিনিস তখন তাঁর খুব ভালভাবে রপ্ত হয়ে গেছে। ভুল ইংরেজীতে ফড় ফড় করে কথা বলে যাওয়া, আর প্রত্যহ নিয়মিতভাবে একটু

একটু করে মদ খাওয়া। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল সাহেবগঞ্জে। সেইখানেই এক ইউরোপীয়ান রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার দয়া করে তাঁকে রেলের এই চাকুরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সে ঋণ অবশ্য তিনি পরিশোধ করবার চেষ্টা যে করেননি তা নয়। সেই ইঞ্জিনীয়ারের যুবতী কন্যাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন আসানসোলে পলের বাসায়। পল তখন সেখানে সামান্য এক ফিটার মিস্ত্রির কাজ করতো। নিতান্ত নিরীহ বেচারা পল তার এই বন্ধুর মতলব বুঝতে পেরে সাবধান করে দিয়েছিল মেয়েটিকে। সেই রাত্রেই, মেয়েটি আমাদের গার্ড সাহেবের গালে একটি চড় মেরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়েছিল তার বাবার কাছে। সেই লজ্জায় তিনি জলের দামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন সাহেবগঞ্জের বাড়িঘরদোর, যা কিছু সব। এমনি ভাবে সাহেবগঞ্জের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তিনি বদলি হয়ে এলেন আসানসোলে। সেখান থেকে এই কোল ডিস্ট্রিক্ট অণ্ডালের এই ব্রাঞ্চ লাইনের গার্ড। ভেবেছিলেন এইখানে একটি বাড়ি তৈরি করে এবার মানুষের মত হয়ে বাস করবেন। তৈরি করলেন প্রসাদপুরের এই বাংলো। গৃহ হলো কিন্তু গৃহিণী কোথায়? প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগালেন গার্ড সাহেব। চেষ্টার ফল ফললো অচিরেই। ফিরিঙ্গী বন্ধু আর বান্ধবী জুটলো বেশ কয়েকটি। জলের মত টাকা খরচ হতে লাগলো আর সেই টাকার লোভে গৃহিণী একজন এলেন সাদা চামড়া অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। কিন্তু বেশিদিন তিনি রইলেন না, তিন চার মাস পরেই শুরু হলো তাঁদের ঝগড়াঝাটির রিহার্সাল। ছ' মাসের ভেতরেই সব খতম। ডাইভোর্স।

এইখানেই শেষ নয়। তার পরেও এসেছিল, আরও দুটো মেয়ে। পল তাদের দেখেই বলেছিল, এরা পালাবে।

একটা পালিয়েছিল এক মাস পরে। আর একজন ছিল মাস তিনেক।

পল তখনই বলেছিল, তুমি একটি বাঙালী মেয়েকে বিয়ে কর গোস্। বাঙালী মেয়েরা অনেক ভাল। নম্র এবং ভদ্র।

সাহেব বলেছিলেন, তোমার নোরা তো বাঙালী নয় পল।

বাঙালী না হলেও নোরার জন্যে পল যা করেছে, আর কেউ তা করতো বলে মনে হয় না। পল যখন নোরাকে বিয়ে করে, নোরার সঙ্গে তখন তার প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়স তখন ন' বছর। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী কিন্তু বিকলাঙ্গ। বসে যখন থাকে, তখন কিছু বুঝতে পারা যায় না। উঠে দাঁড়ালেই দেখা যায়—কোমরটি বাঁকা, পা-দুটি ঠিক জায়গায় পড়ে না, খুঁড়িয়ে চলার ভঙ্গি রীতিমত হাস্যকর। নোরার ধারণা হয়েছিল এই মেয়েটি যতদিন তার সঙ্গে থাকবে, ততদিন কেউ তাকে বিয়ে করবে না। কেনই-বা করবে? একে পরের মেয়ে, তার ওপর বিকলাঙ্গ। তাই নোরা তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে মেয়েটিকে অতিকষ্টে মানুষ করছিল। বিয়েব আগে নোরা তাই পলকে বলেছিল, 'বিয়ে তুমি আমাকে করছো বটে, কিন্তু আমার এই খোঁড়া মেয়েটাকে কতদিন তুমি সহ্য করবে?'

পল কিন্তু তাকে সত্যিই সহ্য করেছে। ন' বছরের ছোট সেই মেয়েটি আজ সতেরো বছরের যুবতী।

পলের ধারণা, নোরা সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করছে। নইলে তার সংসারে এত কষ্ট সহ্য করে নোরা থাকতে যাবে কেন?

যদিও সে অনেক দিন আগেকার কথা, তবু পলের উপদেশ গার্ড-সাহেবের বোধ হয় মনে ধরেছিল। কিন্তু তাঁদের বাঙালী ক্রিশ্চান সমাজটাকে তিনি চেনেন। সুন্দর ছেলে যদি-বা পাওয়া যায়, সুন্দরী মেয়ে সেখানে নিতান্ত দুর্লভ। কাজেই দু' এক জায়গায় চেষ্টা করে গার্ড সাহেব সে-আশা পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু

হঠাৎ একবারে অপ্রত্যাশিতভাবে সংবাদ পেয়ে গেলেন একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের। তারপর কেমন করে কে জানে, হয়ত-বা তাঁর বাইরের চাকচিক্য আর টাকার জোরেই তাকে বিয়ে করে তিনি ঘরে নিয়ে এলেন।

প্রাসাদপুরের বাংলোর চেহারা গেল ফিরে। লক্ষ্মী-শ্রী ফিরে এলো।

পল আর নোরা বৌ দেখতে চাইলে। লোলা জেদ ধরে বসলো সেও দেখবে।

কিন্তু লোলার পক্ষে প্রসাদপুর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। সাহেব একখানা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এলেন রাণীগঞ্জ থেকে। সবাই গিয়ে বৌ দেখে এলো। নতুন করে আবার একটা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন সাহেব।

তা উৎসব করবার মত বৌ তিনি এনেছেন বাড়িতে, বৌ দেখে সবাই সে কথা বলেছিল।

পল বলেছিল, এবার তুমি মদের অভ্যেসটি ছেড়ে দাও মিস্টার গোস্।

গোস্ সেদিন বলেছিলেন ছেড়ে দেবেন। ভগবানের নামে চটপট প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তাঁর রইলো কোথায় ?

পলের বাড়িতে প্রতিদিন নিয়মিত বসতে লাগলো তাঁর মদ্যপানের আসর। সে আসর দিন দিন জেঁকেই উঠ্‌ল।

গার্ড-সাহেবকে চটাতে ভয় হয়। অথচ মদ্যপানের কথা বললেই সাহেব চটে যান।

সাহেব বলেন, ওই তো দুখু মিঞা আমার সঙ্গে যায় রোজ, আমি মাতাল হই কিনা ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

অন্য সময় না হোক অন্তত এই সময়টায় দুখু মিঞাকে

কাছাকাছি কোথাও থাকতে হয়। সাহেবের চামড়ার ব্যাগটি হাতে নিয়ে তাঁকে সামলাতে সানলাতে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হয় প্রসাদপুরের বাড়িতে।

পলের বাংলোটি ছোট। কাছাকাছি থাকতে হলে বাংলোয় ওঠবার সিঁড়ির একটা ধাপে বসে থাকতে হয় দুখুকে।

তাই সে থাকতো। কিন্তু কয়েকদিন হলো বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পাশেই লোলার ঘর। লোলা সেদিন নিজেই তাকে ডেকে বলেছে, বাইরে বসে কেন শীত ভোগ করছ দুখু, ভেতরে এসে বসো।

সেদিন থেকে নজরুল লোলার ঘরে গিয়ে বসে। লোলাব সঙ্গে গল্প করে।

বাংলা বলে লোলা। চমৎকার বাংলা শিখেছে।

সাহেবের ডাক শুনেই নজরুল ছুটে বেরিয়ে গেল লোলার ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছেন?

সাহেব কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, পল তাঁকে থামিয়ে দিলে। বললে, না, কিছু বলেন নি। তুমি যাও।

নজরুল ফিরে আসছিল, সাহেব বললেন, না, যেয়ো না তুমি।

মনিবের কথা, অমান্য করা চলে না। নজরুলকে থামতে হলো।

সাহেবের চোখে তখন রং ধরেছে। বললেন, তুমি তো রোজ আমার সঙ্গে থাকো। বল তো, আমি মাতাল হই?

নজরুল বললে, না।

টলতে টলতে সাহেব বললেন, পল, শুনলে তো! নাও, ঢালো এবার। বলেই তিনি টলতে টলতে তাঁর হাতের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলেন।

আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। নজরুল বললে, শেষ হলে ডাকবেন। আমি এইখানেই আছি।

এই বলে সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসে ঢুকলো লোলার ঘরে।

লোলা নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললে, মিছে কথা বললে যে?

নজরুল বললে, না, মিছে কথা আমি বলি না।

লোলা হাসতে লাগলো।—'সায়েব মাতাল হয় না, এই কথা তুমি বললে?'

নজরুল বললে, শুনবে তবে?

—বল।

নজরুল বললে, এখান থেকে প্রসাদপুর যেতে কত সময় লাগা উচিত জান?

লোলা বললে, আমি কি কোনোদিন গেছি যে, জানবো? তাছাড়া আমি খোঁড়া মানুষ, তোমাদের যদি এক ঘণ্টা লাগে তো আমার কমপক্ষে পাঁচ ঘণ্টা।

নজরুল বললে, আধ ঘণ্টার পথ, আমাদের লাগে দু ঘণ্টা। সায়েব টলতে টলতে চলে, বারে বারে হোঁচট খায়, দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ে রাস্তার ওপর, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেই কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠে, বলে, খবরদার বলছি, গায়ে হাত দিও না, আমি মাতাল হইনি। কখনও হই না।

কথাটা শুনে লোলা হো হো করে হেসে ওঠে। নজরুল বলে, হাসছো কেন? বল, আমি মিছে কথা বলেছি?

হাসতে হাসতে লোলা মাথা নেড়ে বলে, না।

নজরুল বলে, এমনি রোজ। দেয়াল ধরে ধরে বাড়ি ঢুকে সোজা একেবারে বিছানায়।

হাসি থামিয়ে লোলা জিজ্ঞাসা করে, ওয়াইফ্ কিছু বলে না?

কথাটার জবাব দিতে পারে না নজরুল। মাথা হেঁট করে খানিক চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, জানি না।

পলের কোয়ার্টারের পেছন দিকে কিচেন-গার্ডেন করবার মত খানিকটা জায়গা ছিল কাঁটা তাঁর দিয়ে ঘেরা। নোরার ইচ্ছে ছিল সেখানে দুটো আনাজপাতির গাছ লাগাবার। কিন্তু সংসারের সবদিক একা দেখতে গিয়ে সময় পায় না বেচারা। মনের সাধ মনেই থেকে যায়।

লোলা তার মায়ের সেই অতৃপ্ত বাসনা কিছুটা পূর্ণ করেছে। পাশের কোয়ার্টারের মালির কাছ থেকে গোটা চার-পাঁচ দোপাটি আর গাঁদা গাছ চেয়ে নিয়ে পুঁতেছিল সেই বাগানে। আর পুঁতেছিল একটি লাউ-এর বীজ।

সেই দোপাটি আর গাঁদার গাছে ফুল ফুটেছে। আর কাঁটা তারের বেড়া বেয়ে লাউ-এর লতা উঠেছে। সতেজ সবুজ লতা।

লোলার আনন্দের আর সামা সেই। দেখা যায় প্রতিদিন ভোরে উঠে সে তার ক্যানভাসের চেয়ারটি টানতে টানতে বাগানের ধারে নিয়ে এসে চুপটি করে বসে থাকে।

একদিন সে নোরাকে.ডেকে বললে, মা, কাল থেকে আর আমি এখানে বসবো না।

—কেন রে?

লোলা বললে, আজ ক'দিন থেকেই একজন সায়েব এসে আমাকে নানারকম কথা জিজ্ঞাসা করছে। বলছে, সৎ বাপের সংসারে তুমি কি সুখে আছ লোলা? আমার সঙ্গে চলে এসো। আমি তোমাকে বিয়ে করবো। সুখে রাখব।

নোরা বললে, কথাটা তক্ষুনি আমাকে বললি না কেন?

লোলা বললে, আমি তো তার সুমুখে উঠে দাঁড়াতে পারি না মা।

—চেঁচিয়ে ডাকলেই তো পারতিস।

লোলা বললে, দু'বার ডেকেছিলাম, তুমি কাজে ব্যস্ত ছিলে শুনতে পাওনি।

বলেই সে ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো তার মুখের দিকে? নোরা আবার জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবি?

লোলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, প্রথমে ভেবেছিলাম—ভাল কথা বলছে বলুক। তাই প্রথম দু'দিন তোমাকে ডাকিনি। তারপর ধীরে ধীরে আমার কেমন যেন ম'নে হতে লাগলো মনে হলো, লোকটার সব মিছে কথা। বললাম গিয়ে আমার মাকে বল। তখন সে কি বললে জানো? বললে, না, তোমাকে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে হবে। যদি না যাও, আমার লোক জোর করে তুলে নিয়ে যাবে। তখন ভয় পেয়ে যেই ডাকলাম তোমাকে, তক্ষুনি লোকটা পালিয়ে গেল।

নোরা বললে, এবার ডেকে দিস।

লোলা বললে, আমি আর বাইরে বেরুবোই না।

দিনকতক পরে, একদিন দুপুর বেলা পল তখন কাজে বেরিয়েছে, নোরা আর লোলা—দুটো মেয়ে মাত্র বাড়িতে, এমন সময় এক বুড়ো সাহেব, হাতে লাঠি, চোখে চশমা, হঠাৎ এসে দাঁড়ালো নোরার কাছে।

লোকটাকে দেখে নোরা চমকে উঠেছিল প্রথমে।

—হ্যালো নোরা, হাউ ডু উ ডু।

গলার আওয়াজ শুনে নোরার চিনতে দেরী হলো না।

প্রথম যৌবনে যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল, তার সেই প্রথম পক্ষের স্বামী বেট্‌স্। লোলার বাবা।

নোরা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে বললে, এত বুড়ো হয়ে গেছ তুমি?

বেট্‌স্ বললে, বয়সেও ত কম হলো না।

গায়ের জামাটা ছেঁড়া, প্যান্টের হাঁটুর নীচে অনেকখানা সেলাই করা। নোরা জিজ্ঞাসা করলে, এরকম দুর্দশা তোমার হ'লো কেমন করে? তোমার এত টাকা—

বেটস্ বললে, আজ আর তার একটিও নেই। সব ফাঁকা।

গলার আওয়াজটা ধরে এলো তার।

নোরার কেমন যেন দয়া হ'লো লোকটির উপর। জিজ্ঞাসা করলে, কি খাবে বল।

নোরারাও খুব স্বচ্ছল সংসার নয়। তবু তার মনে হলো বেটস্‌কে যদি অন্তত একটা ডিমের ওমলেট আর এক পেয়ালা চা সে খাওয়াতে পারে, মনে যেন একটু তৃপ্তি পাবে।

বেটস্ কিন্তু কিছুতেই খেতে চাইলে না। বললে, নো থ্যাঙ্কস্। খেতে আমি আসিনি নোরা। আমি যে-জন্যে এসেছি শোনো। লোলাকে আমি নিয়ে যাব।

এতদিন পরে এ আবার কি রকম কথা।

অনুনয় বিনয় নয়, কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা বলিষ্ঠ দাবীর আভাস পাওয়া গেল। বললে, তাকে নিতেই আমি এসেছি।

হঠাৎ যেন সুর কেটে গেল নোরার মনের। লোকটির সাজসজ্জা, লোকটির চেহারার সঙ্গে কথার যেন এক বর্ণও মিল নেই। এর চেয়ে বিনীতভাবে যদি সে তার নিজের কন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইতো, নোরা বিপদে পড়তো, সহজে জবাব দিতে পারতো না।

নোরাও কেমন যেন বেশ কঠিন হ'য়ে উঠলো। বললে, খোঁড়া মেয়েটাকে এতদিন পরে হঠাৎ তোমার কেন মনে পড়লো বলতে পারো?

—সে কৈফিয়ত আমি দিতে পারবো না। তুমি তাকে দেবে কিনা বল।

বেটস্ তার মোটা লাঠিটা মেঝের ওপর বারকতক ঠুকলে খুব জোরে জোরে।

নোরা বললে, যদি বলি না!

—পারবে আটকে রাখতে?

নোরা বললে, দুপুর বেলা তুমি কি মদ খেয়েছো বেটস্?

বেট্স্ বললে, হ্যাঁ, খেয়েছি। বেশ করেছি।

নোরা বললে, মাতালের কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যেতে পারো।

—লোলাকে না নিয়ে আমি যাব না।

—নিয়ে যাবে কি জোর করে?

বেটস্ বললে, হ্যাঁ। দরকার হলে আমি জোরই করব।

—বুঝেছি। যে-লোকটা লোলাকে বিয়ে করবে বলেছিল, সে তাহলে তোমারই দলের লোক।

—হ্যাঁ, আমারই লোক। লোলাকে সে বিয়ে করতেই চায়।

—লোলাকে সে ভাল করে ছাখেনি নিশ্চয়ই।

—দেখেছে।

—সে-দেখা নয়। লোলাকে শুধু বসে থাকতে দেখলে মনে হয় অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে দেখলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

বেটস্ বললে, তবু সে তাকেই বিয়ে করবে।

নোরা বললে, তারপর? যখন তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে?

বেট্স্ বললে, ছাড়াছাড়ি হবে কেন?

নোরা বললে, তা হলে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল কেন? আমি তো কদাকার কুৎসিত ছিলাম না, লোলার মত খোঁড়া ছিলাম না।

বেট্স্ সেকথার জবাব দিতে পারলে না। বললে, তোমার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাই না। লোলাকে তুমি এমনিতে ছাড়বে না এই কথাই আমি জেনে গেলাম। দেখি তুমি কেমন করে ওকে আটকাতে পারো।

এই কথা বলে বেট্স্ উঠে দাঁড়ালো। তারপর কটমট করে নোরার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নোরার মাথাটা তখন ঘুরছে। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। লোকটি কোন্‌দিকে যায় দেখবার জন্যে বাইরে এলো সে। কিন্তু যাকে দেখবার জন্যে সে বেরিয়ে এলো, তাকে দেখতে গিয়ে নজরে পড়লো, লোলা তার ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে তন্ময় হ'য়ে তাকিয়ে আছে তার জন্মদাতা পিতার দিকে।

হতভাগী সবই শুনেছে তাহলে।

নোরার চোখ থেকে টস টস করে কয়েক ফোঁটা জল পড়লো তার জামার ওপর। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল আস্তে আস্তে।

বিকলাঙ্গ ওই খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে সারাদিন সে একাই থাকে তাদের এই কোয়ার্টারগুলোও ফাঁকা হয়ে যায়। বেট্‌স যদি সত্যিসত্যিই জোর করে একদিন নিয়ে যেতে চায় লোলাকে ?

পলকে বলে কোনও লাভ নেই। বেচারা কষ্ট পাবে শুধু শুধু।

তার একমাত্র ভরসা গার্ড-সাহেব।

পুলিশে খবর দিলে কেমন হয় ? নোরা ভাবলে, আসুক মিষ্টার ঘোষ, তাকে জিজ্ঞাসা করবে—কি করা উচিত।

গার্ড-সাহেবের আসার আশায় বসে রইলো নোরা।

মোটা একটা শালকাঠের টুকরো পড়েছিল বাগানের কাছে। নোরা সেইটে হাতে নিয়ে লোলার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। লোলা হাসতে হাসতে বললে, একি ? তুমি আমাকে মারবে নাকি মা ?

এত দুঃখেও নোরার মুখে ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠল। বললে, নে, এইটে রাখ্‌ হাতের কাছে।

ঘরের জানলাটা সে খুলে দিয়ে বললে, ঘরে খিল বন্ধ করে বসে থাক লোলা। তোর বাবাকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বলতে বলতে মুহূর্তে আবার তার চোখ দুটো সজল হয়ে এলো।

লোলা তার মাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। বললে, তুমি ভেবো না মা, তোমার কাছ থেকে কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলাটা তার ধরে এলো। কিছুই সে বলতে পারলে না। হরিণের মত জল-ভরা দুটি চোখ তার মায়ের দিকে তুলে ধরে আস্তে শুধু ডাকলে, মা!

ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো, আর দেখা গেল আপনমনে গান গাইতে গাইতে নজরুল আসছে। আজকাল রোজই সে ঠিক এই সময়েই আসে প্রসাদপুর বাংলো থেকে। সাহেবের ডিউটির সঙ্গে সঙ্গে তারও ডিউটি বদলে যায়।

নজরুলকে দেখে নোরা খানিকটা আশ্বস্ত হলো। তবু একজন জোয়ান ব্যাটাছেলে এলো বাড়িতে।

এইবার পল আসবে। তারপর আসবে গার্ড-সাহেবের গাড়ি।

লোলার ঘরের দোরটা বন্ধ দেখে নজরুল ফিরে আসছিল, নোরা ডাকলে, লোলা, দরজা খোল্!

উনোন ধরে গেছে। নোরা গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে। খাবার তৈরি করতে হবে। এক্ষুনি এসে পড়বে সবাই।

ঠিক সময়ে পল এলো। তার সামনে খাবার ধরে দিয়ে নোরা বসলো সুমুখে। বেট্সের কথা একটি একটি করে সবই সে তাকে বললে।

পল বেশ জোরের সঙ্গে বললে, ভেবো না। লোলাকে পারবে না নিয়ে যেতে। আইন তোমার দিকে। দরকার হলে আদালতে যাব।

নোরা ম্লান একটু হাসলে। বললে, দেখে যা মনে হলো আইন-আদালতের ধার দিয়েও সে যাবে না।

পল বললে, বুঝতে পেরেছি। ভদ্রলোকের অবস্থা খুব

খারাপ হয়ে গেছে। এখন সে লোলাকে বিক্রি করে কিছু টাকা রোজগার করতে চায়।

কথাটা শুনে শিউরে উঠলো নোরা। আবার তার চোখে জল এলো। বললে, দুপুরে সবাই কাজে চলে যায়, চারিদিক খাঁ খাঁ করে, বাড়িতে থাকি তো আমারা দুই মা আর মেয়ে। দুটো জোয়ান গুণ্ডা নিয়ে এসে দাঁড়ায় তো কিছুই করার থাকবে না।

' পল একটু ভেবে বললে, কালই আমি পুলিশে একটা ডায়েরী করে রাখবো।

কথাটার নিষ্পত্তি হবার আগেই গার্ড-সাহেব এলেন।

তিনিও শুনলেন সব।

শুনে তাঁর বড় বড় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলে। টেবিলের ওপর সজোরে এক কিল মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, দুখু!

নজরুল এসে দাঁড়ালো : বলুন!

—তুমি একটি কাজ করতে পারবে?

—সব কাজই তো করছি স্যার।

সাহেব বললেন, তাহলে কোমর বাঁধো। লোলাকে নিয়ে চলে যাও আমার প্রসাদপুরের বাংলোয়। মেম-সাহেবকে বোলো, দক্ষিণদিকের ঘরখানা লোলাকে ছেড়ে দিতে। যে-ঘরে পিয়ানো আছে। তারপর দেখি ওকে কে নিয়ে যেতে পারে!

নজরুল বললে, লোলা কি পারবে অতখানি পথ হেঁটে যেতে?

নোরা বললে, পারবে। তবে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে না। দেরি হবে।

সাহেব বললেন, তা হোক। আমি রইলাম এইখানে। লোলাকে রেখে তুমি ফিরে এসো। লোলার জিনিসপত্র পরে নিয়ে গেলে চলবে।

সাহেবের যে-কথা সেই কাজ! নোরাও ভাবলে সেই ভালো। লোলাকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিলে হয়ত ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে।

কিন্তু যাবার সময় নোরা কি ভাবলে কে জানে। বললে, আমিও যাচ্ছি লোলার সঙ্গে। ওকে ওখানে রেখেই আমি আবার ফিরে আসছি।

এই বলে লোলার জামা জুতো একটা স্যুটকেসে ভরে নিয়ে নোরাও বেরিয়ে পড়লো তাদের সঙ্গে।

পরের দিন দুপুরে বেট্‌স্ আবার এলো।

জামা ইস্ত্রি করছিল নোরা। লোলাকে রেখে এসেছে প্রসাদপুরে। বাড়িটা তার একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। চোখের জল কিছুতেই বাধ মানছে না।

ঠিক এমনি সময় বেট্‌স্ এসে দাঁড়ালো তার কাছে। বললে, কি ঠিক করেছ বল! কাঁদছো কেন?

নোরা বললে, কেন কাঁদছি শুনবে? লোলা কাল রাত্রে পালিয়েছে।

কথাটা শুনেই দপ্ করে জ্বলে উঠলো বেট্‌স্। বললে, পালিয়েছে না তুমিই সরিয়ে দিয়েছ?

—কোথায় সরাবো? ত্রিভুবনে আমার সরাবার কোনও জায়গা আছে?

এই বলে নোরা কাঁদতে লাগলো।

কি জানি কেন বেট্‌সের বিশ্বাস হয়ে গেল কথাটা। বললে, পালাবেই তো! এতদিন পালায়নি এই যথেষ্ট। বয়েসটাও তো কম হয়নি তার।

নোরা বললে, না পালালো তোমার জন্যে। তুমি যদি কাল চীৎকার করে ওই-সব কথা না বলতে তাহলে লোলা হয়ত এমন করে আমাকে ছেড়ে চলে যেতো না।

বেট্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, কার সঙ্গে পালিয়েছে কিছু জানো?

নোরা হঠাৎ বলে ফেললে, একজন মুসলমান বয়ের সঙ্গে।

কথাটা বলেই তার মনে হলো—বলা তার উচিত হলো না।

বেট্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, কি নাম তার, কোথায় বাড়ি ?

নোরা বললে, তা আমি কেমন করে জানবো ?

—কার বয় তা তো জানো।

নোরা ভয়ে-ভয়ে বলে ফেললে, ব্র্যাঞ্চ লাইনের একজন গার্ড-সাহেবের বয়। তার নাম ঠিকানা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করছি।

বেট্‌স্ বললে, আমিও দেখছি।

এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

নোরা তখন ভয়ে থর্ থর করে কাঁপছে। এ কি করলে সে ? এতখানি তাকে না বললেই হতো !

গার্ড-সাহেবের হদিস পেয়ে যদি সে প্রসাদপুরে চলে যায় ?

বেট্‌স্ চলে গেল। নোরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। কোনও কাজেই তার মন বসলো না।

গার্ড-সাহেব আসতেই নোরা তাকে বললে সব কথা। বললে, একটা মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। আমি যা তা বলে ফেললাম।

সাহেব বললেন, বলেছ—বেশ করেছ। কি করবে ও ? আমার ওখান থেকে লোলাকে বের করে আনবে ? ছো—

নোরা বললে, কিন্তু, 'গার্ড-সাহেবের মুসলমান বয়, কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি।

কথাটা সাহেব হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, কিছু অন্যায় হয়নি। আমার বেট্‌সের সঙ্গে দেখা হ'লে বলতাম—তুমি গুণ্ডা নিয়ে এসে হাঙ্গামা করতে পারো, এরা গরীব মানুষ, সহায়সম্বল কিছু নেই, তাই আমি লোলাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছি আমার বাড়িতে। তোমার ক্ষমতা থাকে তো একবার লড়ে দেখতে পারো।

এই কথা বলবার পরেও, সাহেবের কি মনে হলো কে জানে, পারের দিন সকালে চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়েই ডাকলে, দুখু।

নজরুল এসে দাঁড়াতেই বললেন, দিনকতকের জন্যে তুমি গা-ঢাকা দিতে পারো ?

—পারি।

সাহেব বললেন, তাহলে আজই তুমি খেয়েদেয়ে চলে যাও এখান থেকে।

এই বলে পঞ্চাশটি টাকা তিনি তার হাতে গুঁজে দিলেন।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে নজরুল বললে, এত কেন ?

সাহেব বললেন, এত নয়। পঁচিশ টাকা হিসেবে তোমার দু'মাসের মাইনে। আর কিছু নয়।

নজরুলের চাকরি এইখানেই খতম !

সেই যে সে গা-ঢাকা দিয়েছিল, জীবনে আর কোনদিনই সে প্রাসাদপুরের বাংলোয় ফিরে যায়নি।

ছয়.

রবিবার বিকেল। বাড়ি থেকে বেরুবো বেরুবো করছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। চেনা-চেনা মুখ, অথচ ঠিক ঠিক চিনতে পারছি না। তুমি শৈল? বলেই তিনি সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। ঘর-জোড়া নীচু তক্তাপোশের ওপর শতরঞ্চি পাতা। আমাদের পড়বার ঘর।

হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। জুতো খুলে তক্তাপোশের ওপর উঠে নিজের পরিচয় তিনি নিজেই দিলেন।

—শিয়াড়শোল ইস্কুলের টিচার আমি। নজরুল আমার ছাত্র।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ভাল করে চেপে বসলেন তিনি।

বিপদে পড়লাম। নজরুল ওদিকে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। দু'জনে একসঙ্গে বেরুব। মাস্টারমশাই বললেন, দেখি কি লিখেছ তুমি।

সর্বনাশ! কে বললে আপনাকে?

—নজরুল বললে, তুমি নাকি খুব ভাল পদ্য লিখতে পারো। বললাম, ভুল বলেছে। নজরুল আমার চেয়ে অনেক ভাল কবিতা লেখে।

ভদ্রলোক কিছুতেই বিশ্বাস করেন না, বার বার বলতে থাকেন, বাংলায় ভাল 'এসে-টেসে' লেখে শুনেছি। আমি তো

বাংলা পড়াই না। তবে তোমার কথা শুনলাম আমি নজরুলের কাছে—চণ্ডীর কাছে····। কই নিয়ে এসো তোমার খাতাখানা—দেখি।

খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। কবিতা লেখা, গল্প লেখা—এ-বাড়িতে অমার্জনীয় অপরাধ। খাতাটা আমি লুকিয়ে রাখি অন্য ঘরে। এনে যদি দিই, এক্ষুণি উনি জোরে জোরে পড়তে শুরু করবেন, আর সেই পড়া যদি সীতু-চাকরটা শোনে তো যেমন করে হোক ওপরে গিয়ে রায়-সাহেবকে জানিয়ে আসবে।

তার চেয়ে কবিতার খাতাটা পকেটে নিয়ে মাষ্টারমশাইকে বাগানে নিয়ে গিয়ে বসাই ভালো। বাগানের পাশেই নজরুলের বোর্ডিং। ছুটে গিয়ে তাকেও ডেকে আনা যাবে।

চট্ করে জামাটা গায়ে দিয়ে বললাম, আসুন স্যার আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

ওঠবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বললেন, তার চেয়ে তোমার খাতাটা আমাকে দাও, কাল আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

—খাতা নিয়েছি, আপনি আসুন।

বলেই তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে নিয়ে গেলাম বাগানের পথে।

আমার খাতাটা তাঁকে দেখাতে লজ্জা করছে।

বাগানের দিকে যেতে যেতে মাস্টারমশাইকে বললাম, আপনি স্যার নজরুলের কবিতা পড়েননি তাই বলছেন। আমার খানিকটা মুখস্থ আছে, শুনবেন ?

এই বলে তার 'রাণীর গড়' কবিতার আরম্ভটা শুনিয়ে দিলাম।

> ওই—ঝাউএর পাহাড়ে নীরব চিতাটি রাণীমার !
> ও যে—দপ্ দপ্ জ্বলে, লোকে বলে আলো আলেয়ার।
> এই নিবে যায় এই জ্বলে ওঠে
> থমকি চমকি পিছু দিকে ছোটে,

মিশে যায় শেষে রাজ-গড়ে উঠে
আবার তেমনি আঁধিয়ার।
ওই শোনা যায় দু'পহর রাতে
ঝটিকাব মুখে হাহাকার।
ওগো রাণীমার—আহা রাণী মার।
ওই ঝাউএর পাহাড়ে
নীরব চিতাটি রাণী-মার।

আরও বলতে যাচ্ছিলাম মাষ্টারমশাই আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, তাহলে নজরুলকেই বলি। না কি-বল?

—কি বলবেন?

এতক্ষণ পরে তিনি তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। বললেন, শিয়াড়শোল ইস্কুলের একজন পুরনো টিচার এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। তার জন্য ছাত্রদের তরফ থেকে দুঃখুটুঃখু জানিয়ে বেশ ভাল করে একটি পদ্য লিখে দিতে হবে। সেই পদ্যটি তাঁরা ছাপবেন। তারপর একটি বিদায়সভা আহ্বান করে তাঁর গলায় ফুলের মালা দিয়ে সেই ছাপা মানপত্রটি তাঁর হাতে দেবেন—এই তাঁরা স্থির করেছেন।

বললাম, তাহলে তো আপনাদের উচিত নজরুলকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া। নজরুল শিয়াড়শোল ইস্কুলের ছাত্র আর আমি রাণীগঞ্জের।

বলতে বলতেই দেখা গেল, বাগানের পথ ধরে নজরুল আমাদের দিকেই আসছে। মুখে তার হাসি—যেমন লেগে থাকে সব সময়।

বললাম, বেশ মজা তো! মাষ্টারমশাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছ?

নজরুল তখনও হাসছে।

বললাম, তোমাদের টিচারের বিদায়-অভিনন্দন আমি কেন লিখবো? তুমি লিখবে।

কবিতা লিখতে পারে না বলে প্রথমে সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমিই তাকে রাজী করালাম। মাস্টার-মশাই-এর ওপর রইল আদায় করবার ভার।

আমি রক্ষা পেলাম। আমার কবিতার খাতা আমার পকেটেই রয়ে গেল।

মাস্টারমশাই চলে যেতেই নজরুল বললে, এ তুমি কি করলে বল তো?

—কি করলাম?

নজরুল বললে, এইবার লেখো বানিয়ে বানিয়ে যত রাজ্যের মিথ্যে কথা।

তা হোক। এ আর তোমার লিখতে কতক্ষণ।

নজরুল বললে, না না এইগুলো লিখতেই তো দেরি হয়। তা ছাড়া আমি এখন অন্য কথা ভাবছি।

ফার্স্ট ক্লাশে উঠেছি আমরা। হাতেই কোয়ার্টালি পরীক্ষা। ভাবলাম বুঝি পরীক্ষার পড়ার কথা বলছে।

বললাম, তুমি তো ভাল ছেলে, তোমার আবার পরীক্ষার জন্যে ভবনা কিসের?

নজরুল বললে, না, পরীক্ষার ভাবনা নয়। চল একটা মজা দেখিয়ে আনি তোমাকে।

এই বলে সে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো রাস্তা দিয়ে।

পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল বংশী আর দ্বারকা। রাণীগঞ্জ ইস্কুলের ছাত্র। নজরুলকে খুব ভাল করেই চেনে। ধরে বসল, চা খেয়ে যাও।

বসতে হলো।

বংশী বলছে, চা খাও, আর দ্বারকা বলছে, একটি গান গাও।

নজরুল উস্‌খুস্ করছে। দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে আর আমাকে চিমটি কাটছে। বংশী বাড়ির ভেতরে

গেল চা আনতে, আর দ্বারকা হারমোনিয়াম আনবার জন্য তৈরী।

দ্বারকা আমাদের চেয়ে ছোট, পড়েও দু'ক্লাশ নীচে। তবু সে আমদের অনেক দিনের বন্ধু। হলেও তাকে তিরস্কার করতে আটকায় না। ধমক দিতেই সে চুপ করে বসল।

চা আনতে দেরি হলো না বংশীর। চা খেয়েই উঠলুম।

বললাম, খুব জরুরী একটা কাজে বেরিয়েছি ভাই—চলি।

জরুরী কাজটা যে কী, তখনও আমি জানি না।

পথে যেতে যেতে আবার ডাক পড়ল পেছনে।—শোনো। শোনো! যাচ্ছ কোথায়?

এই রে! গোপেশ্বর ডাকছে। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর গোপেশ্বর পাল। বিলেত থেকে যিনি যথেষ্ট সম্মান অর্জন করে এনেছিলেন। ভারতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন যে প্রতিভাবান শিল্পী—স্বর্গীয় সেই গোপেশ্বরের জীবনের একটি অজানিত অধ্যায় আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর সেই হতভাগ্য শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিল ভারতবর্ষের এই বাংলাদেশে। তাই তার যৌবনদিনে 'আপন গন্ধে ফিরি মাতোয়ারা কস্তুরীমৃগ সম' ছুটে বেড়াচ্ছিল যেখানে সেখানে। যে বিদ্যায় ছিল তার জন্মগত অধিকার, তার কোনও সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই, কি করবে সে, কোথায় যাবে—কিছুই ঠিক করতে না পেরে একদিন একটি সুটকেস হাতে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল আমাদের সেই কয়লাকুঠির দেশে—রাণীগঞ্জে। আমাদের সঙ্গেই হলো তার প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম তার কাজ দেখে। আমাদের ইস্কুলের খাতা টেনে নিয়ে তারই একটা সাদা পাতায় পেন্সিল দিয়ে যাকে দেখলে তারই চেহারা এঁকে দিলে এক মিনিটে। অর্জুনপটির রাস্তার ধারে ছোট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে আস্তানা গাড়লো। তারপর আরম্ভ হলো তার নয়নাভিরাম মাটির কাজ। আমাদের যাকে

হোক একজনকে টুলের ওপর বসিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে মাটি দিয়ে তার এমন মূর্তি গড়ে দিলে—আমরা দেখে তো অবাক। ঘড়ি ধরে মাত্র পাঁচ মিনিট। তার ভেতরের মূর্তি গড়া শেষ। নির্ভুল, নিখুঁত একেবারে হুবহু প্রতিমূর্তি! কিন্তু বিনামূল্যে এরকম বন্ধু-কৃত্য আর কতদিন চলে? টাকা কোথায়? গোপেশ্বর বললে, দশটা টাকা পেলেই আমি এইরকম মূর্তি গড়ে দেবো। আমরা প্রচার করে দিলাম সর্বত্র। সারা শহর ভেঙে লোকজন আসতে লাগল। কিন্তু টাকা দিয়ে কেউ কাজ করাতে চাইলে না। আমরা যাই, বসি, গল্প করি, কত রকমের কত জল্পনাকল্পনা চলতে থাকে। আমরা বলি, ইস্কুল কর, আমরা সবাই তোমার স্কুলের ছাত্র হব। গোপেশ্বর হাসে। বলে, সেরকম ইস্কুল এখানে চলবে না। বড় বড় মূর্তি গড়বার কিছু অর্ডার যদি পাই তো আরও কিছুদিন থাকি তোমাদের কাছে।

কিছু না পেয়েও সে রইল।

আমরাও তাকে ছাড়তে চাইতাম না, সেও আমাদের ছেড়ে থাকতো না।

নজরুল একদিন গিয়েছিল আমার সঙ্গে। শিয়াড়শোল ইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমার বন্ধু। এই তার পরিচয়। গোপেশ্বর তার মুখের পানে বিশেষ দৃষ্টিতে বার-কতক তাকালে। তারপর আমরা যখন উঠে আসছি, গোপেশ্বর আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, রবিবার দুপুরে তোমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে এখানে আসবে?

মুণ্ডু তৈরি করবে বুঝি?

গোপেশ্বর বললে, হাঁ।

বললাম, তবে যে সেদিন বললে, টাকা পয়সা না পেল ও-কাজ আর করবে না কখনো?

আজও আমার বেশ মনে আছে—গোপেশ্বর বলেছিল, তোমার

এই বন্ধুটি একদিন মস্ত বড় হবে। সে চিহ্ন আমি দেখেছি ওর মুখে।

নজরুলকে আমি সেকথা বলেছিলাম। বলা বোধহয় আমার উচিত হয়নি।

বলেছিলাম বলেই বোধ হয় রবিবারের কোন দুপুরেই তাকে আনতে পারিনি গোপেশ্বরের কাছে।

আজ সেই গোপেশ্বর ডাকছে।

নজরুল বললে, বল আর-একদিন আসবো।

পেছন ফিরে সেই কথাই বলে গেলাম গোপেশ্বরকে।

একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে হলো। নজরুল বললে, তুমি দেরি করে দিলে। অর্থাৎ বংশীর বাড়িতে চা খাওয়ার অপরাধে অপরাধী আমি।

বললাম, মজা দেখা তাহলে আর হলো না বল।

নজরুল কিন্তু তখনও ছাড়েনি। বললে, চলই-না।

গেলাম স্টেশনে। ওভার-ব্রিজের ওপর দিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মে।

হাওড়া থেকে একখানা ট্রেন আসবে। লোকজনের যাওয়া-আসা শুরু হয়ে গেছে। এসময় এখানে আসা আমাদের উচিত হয়নি।তবে ষ্টেশনের কর্মচারীরা সবাই আমাদের চেনে—এই যা ভরসা। নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ আসবে নাকি কলকাতা থেকে?

ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগনালের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে নজরুল। জবাব দিলে না।

দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল।

সামনের কামরায় বাঙালী পল্টনের দল। খাকি প্যাণ্ট পোষাকে নানান বয়সী ছেলেরা যুদ্ধে চলেছে। নজরুল প্রথমেই হাত তুলে বলে উঠলো, 'বন্দেমাতরম্!'

গাড়ি থেকে নেমে যে-সব যাত্রী চলে যাচ্ছিল, তারাও দাঁড়াল আমাদের পেছনে। দল আমাদের ভারি হয়ে গেল আস্তে আস্তে। বুঝুক না বুঝুক তারাও চেঁচাতে লাগল আমাদের সঙ্গে। সারা ষ্টেশন মুখরিত হয়ে উঠল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে। লোকজন সব দাঁড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। জানলায় মুখ বের করে হাত নেড়ে রুমাল নেড়ে পল্টন-ছেলেরা চলে গেল। নজরুল স্থির দৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

যারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল তাদের ভেতর থেকে কে-একজন যেন জিজ্ঞাসা করলে, এরা কে ভাই? যাচ্চে কোথায়?

জবাব আমাদের দিতে হলো না। তাদেরই একজন বললে, বাঙালী পল্টন। লড়াই করতে যাচ্ছে।

তার পরেই শুরু হলো নানান মন্তব্যের শিলা-বৃষ্টি।

—এরা লড়াই করবে কি বলছেন? কামান-বন্দুকের আওয়াজেই দাঁত লেগে যাবে যে।

আর-একজন বললে, অকালে মৃত্যু আছে কপালে, তাই চললো মরতে।

—সবগুলোই তো ছেলেমানুষ। ভগবান জানে বাপ-মা ছেড়ে দিলে কেমন করে?

এমনি-সব কথা শুনতে শুনতে আমরা বেরিয়ে এলাম স্টেশন থেকে।

নজরুল এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। আমিই প্রথমে তার নীরবতা ভঙ্গ করলাম। বললাম, এই বুঝি তোমার মজা?

জবাবে সে শুধু আমার হাতখানা চেপে ধরে বললে, যাবে?

কি সে বলতে চায় বুঝলাম।

কেন জানি না, সেদিন তার এই প্রশ্নের জবাব দিতে আমার একমুহূর্তও দেরি হয়নি। বললাম, হ্যাঁ যাব।

পথের ধারে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। মাথার ওপর প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের পাতায় পাতায় একটানা আওয়াজ উঠছে। পথের ধুলোর ঝাপ্টা এসে লাগলো সারা মুখে। চোখ মুখ বন্ধ করে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম।

শহরে তখন নিত্য নতুন পোস্টার পড়ছে। নানারকম রঙ-বেরঙের বড় বড় পোস্টার আঁটা হচ্ছে শহরের অলিতে গলিতে। কত বিচিত্র তার ছবি, কত বিচিত্র তার ভংগী আর কত বিচিত্র তার ভাষা।

বাঙালী যুবকদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা চলছে ক্রমাগত। 'কে বলে বাঙালী যোদ্ধা নয়? কে বলে বাঙালী ভীতু? জাতির এই কলঙ্ক মোচন করা একান্ত কর্তব্য, আর তা পারে একমাত্র বাংলার যুবশক্তি। ঝাঁপিয়ে পড় সিংহ-বিক্রমে। বাঙালী পল্টনে যোগ দাও! দুর্ণাম ঘুচুক।'

ইংরেজ যুদ্ধ করছে জার্মানীর সঙ্গে। আমরা তখন এইটুকুমাত্র জানি। ইংরেজের প্রতি আমরা কেউ প্রসন্ন নই, তার ওপর রাজার প্রতি ভক্তি যেটুকু থাকা প্রয়োজন তাও নেই। তবু আমরা ইংরেজের হয়ে তার শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে কেন যাচ্ছি সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম নজরুলকে।

নজরুল বললে, যুদ্ধ একটা বিদ্যা তা জানো?

বললাম, জানি!

—সেই বিদ্যেটা আমরা শিখে নেবো আচ্ছা করে।

বললাম, শেখা শেষ হলেই তো দেবে ঠেলে।

—দিক না।

—তখন জার্মানীর একটি গুলি, ব্যাস্—

—মরে যাবে? বেশ তো! যুদ্ধ করতে করতে মরে যাওয়া—ভারি মজা। মারতে মারতে মরবো।

নজরুলের সে কি উল্লাস!

কিন্তু সত্যি বলতে কি, যতই ভাবছি আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে।

নজরুল মারতে পারবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি জানি, আমি পারবো না। হাতে বন্দুক আছে বলেই জলজ্যান্ত একটা মানুষকে শত্রু কল্পনা করে নিয়ে মেরে ফেলবো—সেটা বোধ হয় আমার দ্বারা কখনো হয়ে উঠবে না।

নজরুল বললে, তোমার দ্বারা না হলেও তার দ্বারা হবে। সে মেরে দেবে তোমাকে। আত্মরক্ষা করবার জন্যে মারতে হয়, নইলে নিজে মরবে।

সেকথা আমি কিন্তু ভেবে দেখিনি।

নজরুল যুদ্ধবিদ্যা শিখে এসে ভারতবর্ষে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করবে, তারপর দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে—তার এই গোপন মতলবের কথা আমাকে সে বলেছিল একদিন।

আমার কিন্তু কোনও মতলব ছিল না।

আমি যেতে চেয়েছি সঙ্গসুখে।

নজরুল চলে যাবে রাণীগঞ্জ ছেড়ে, আর আমি এখানে পড়ে থাকবো একা, রোজ দশটার সময় বই খাতা নিয়ে ইস্কুলে যাব, আর বিকেলে ফিরে আসবো—একঘেয়ে নির্বান্ধব এই নিরানন্দ জীবন আমি চাইনি।

তার ওপর যুদ্ধ কথাটায় একটা উত্তেজনা আছে। আমি তখন অপরিণতবয়স্ক এক কিশোর। সে উত্তেজনা, সে উন্মাদনার হাত থেকে নিস্তার পেলাম না।

নজরুলের সঙ্গে নিভৃতে বসে পরামর্শ করলাম—কেমন করে যাওয়া যায়। ছিনু চলে গেছে তার দেশের বাড়িতে বিয়ে-সাদি করতে, নইলে নজরুলের বোডিংএর খাটে বসে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা কখনো সম্ভব হতো না। তাও বেশির ভাগ দিন আমরা পরামর্শের জন্য চলে যেতাম ক্রিশ্চানদের কবরখানায়। শহরের এত কাছে এমন নির্জন জায়গা সচরাচর পাওয়া যায় না।

বাঙালী পল্টনের পোষ্টারের নীচে ছাপা থাকতো, মহকুমার

সাব-ডিভিস্তনাল-অফিসারের (এস. ডি. ও.) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রাণীগঞ্জের মহকুমা-শহর হল আসানসোল। বেশি দূরে নয়। যাওয়াও খুব সহজ। স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চড়ে বসলেই হ'লো। টিকিটের দাম কত ছিল আজ আর ঠিক মনে নেই।

শুধু মনে আছে এস্-ডি-ও যিনি ছিলেন তিনি সাহেব। খাস বিলেত থেকে সবে কিছুদিন হ'লো এসেছেন বাংলা দেশে আই-সি-এস্ পাশ করে।

তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাঁর ইংরেজী যদি আমরা বুঝতে না পারি তখন কি হবে? তবে ভরসা এই যে, পুরো দুটি বছর ধরে আমাদের রাণীগঞ্জ ইস্কুলে প্রতি শনিবার খাস বিলেতী এক পাদরী-সাহেব আমাদের বাইবেল পড়াচ্ছেন। তার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে বলে আর ইংরেজী নভেল পড়ে পড়ে ইংরেজী খানিকটা বোধ হয় রপ্ত করে ফেলেছি।

নজরুল বললে, চল তো যাই আসানসোলে, দেখা করি সাহেবের সঙ্গে, তারপর যা হয় হবে।

হাতে কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা। বললাম, পরীক্ষার কি হবে?

নজরুল তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। বলে, রেখে দাও তোমার পরীক্ষা।

আমি কিন্তু পরীক্ষা না দিয়ে কিছুতেই আসানসোল যেতে চাইলাম না। কাজেই যেতে কয়েকটা দিন আমাদের দেরি হয়ে গেল।

আমার মনের ভেতর তখন দুটো প্রশ্ন ক্রমাগত জট পাকাচ্ছে কিছুতেই তার মীমাংসা করে উঠতে পারছি না। আমরা যুদ্ধে চলে যাচ্ছি—সে-কথা যতীনকে আর দিদিকে জানাবো কিনা। এ গেল প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—এই সর্বনাশা সংবাদ আমি জানাবো কিনা আমার মাতামহীকে। অতি শৈশবে আমার মা মারা

গেছে। তারপর থেকে তিনি আমাকে আদর যত্নে মানুষ করে তুলেছেন। এ-পৃথিবীতে আমিই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত মেয়ে—তাঁর কাছে যুদ্ধে যাওয়া মানেই চিরজীবনের জন্য যাওয়া।

যতীনকে বলতে পারি, দিদিকে বলতে পারি, কিন্তু তাঁকে আমি বলবো কেমন করে?

কিছুতেই রাত্রে ঘুম হলো না।

পরীক্ষার ভাবনা তোলা রইলো, এখন এই ভাবনাটাই সবচেয়ে বড় ভাবনা হয়ে উঠলো আমার কাছে।

সকালে কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরোই না, পরের দিন কিন্তু চা খেয়েই চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। সোজা চলে গেলাম নজরুলের বোর্ডিং-এ। গিয়ে দেখি, নজরুল তখনও তার বিছানায় শুয়ে রয়েছে। ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ আগে। মুখ হাত ধুয়ে এসে চাও খেয়েছে একবার। আবদুল বললে, কাল অনেক রাত পর্যন্ত কি যেন লিখছিল। তাই বোধ হয় ঘুম ভাঙেনি, আবার গড়িয়ে নিচ্ছে।

মাথার বালিসটা বুকের নীচে জাপটে ধরে উপুড় হয়ে শুয়েছিল নজরুল। গায়ে হাত দিতেই আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো। উঠে বসেই চেঁচাতে লাগলো, আবদুল, আবদুল, দে ভাই দু' পেয়ালা চা। ধেৎ তেরি, ছিনু নেই, থাকলে এতক্ষণ পাঁচ পেয়ালা দিয়ে যেত।

জিজ্ঞাসা করলাম, ছিনুর কথা ভাবছিলে বুঝি?

নজরুল বললে, সে হতভাগা বোধ হয় আর আসবে না। এলে দেখা হতো।

—তবে কার কথা ভাবছিলে?

বুঝতে পারলে বোধ হয়। কথাটা একটু জোরে জোরেই বলেছিলাম।

নজরুল বললে, চা খাও।

আবদুল চলে যেতেই নজরুল বললে, আর দেরি কেন, চল, কালই যাই আসানসোলে।

বললাম, কাল থেকে পরীক্ষা যে।

নজরুল বললে, পরীক্ষা আর দিতে হবে না। কি হবে পরীক্ষা দিয়ে! 'আমি তো আর ইস্কুলেই যাব না।

পরীক্ষা না দিলে দাদামশাই জানতে পারবে। জানাজানি হয়ে গেলেই বিপদ! লুকিয়ে পালাতে হবে। বললাম, তুমি কি বলে যাবে তোমার বাড়িতে?

—পাগল হয়েছ? আমি আর বাড়িই যাব না।

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিলাম নজরুলকে, তোমার মন কেমন করছে না?

নজরুল বলেছিল, না। মন কেমন করবার মত কেউ আমার নেই।

এর ওপর আর কথা চলে না। আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

আমার পরীক্ষা আরম্ভ হলো। নজরুলের ইস্কুলে পরীক্ষার দিন ধার্য হয়েছিল তারও পরে।

কি রকম পরীক্ষা দিলাম জানি না। সে ক'দিন নজরুলের সঙ্গে দেখাও করিনি।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো, ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি, দেখলাম নজরুল দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। বললে, কাল আসানসোল যাচ্ছি।

বেলা এগারোটায় ট্রেন। কথা হলো, নজরুল আসবে আমার কাছে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যাব বাড়ি থেকে।

পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে দু'জনে গিয়ে নামলাম আসানসোল স্টেশনে। স্টেশন থেকে কোর্ট বেশ কিছু দূরে। আবার একটা ট্রেনে চড়ে যেতে হয়। আমাদের কিছুই জানা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলাম।

দেখা করলাম এস-ডি-ও সাহেবের সঙ্গে। বললাম, যুদ্ধে যাব। বেঙ্গলী রেজিমেন্টে নাম লেখাতে চাই আমরা।

এস-ডি-ও সাহেব ভারি খুশী। আমাদের দু'জনের কাঁধে দুটো হাত রেখে, নিয়ে গেলেন তাঁর বাংলোর ভেতর। খুব সমাদর করে বসালেন আমাদের। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। খুব ধীরে ধীরে স্পষ্ট পরিষ্কার করে ইংরেজী বললেন। বুঝতে এতটুকু কষ্ট হলো না।

দু'জনকে দু'গ্লাস লেমনেড খাওয়ালেন। আমরা বসে বসে লেমনেড খাচ্ছি, সাহেব আমাদের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছেন আর কাগজে কি যেন লিখছেন।

লেখা শেষ হলে বিলিতী বিস্কুটের বড় দুটি টিন আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই বিস্কুট তোমরা পথে যেতে যেতে খাবে। খাবার সময় আমাকে মনে পড়বে। এই বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, এখান থেকে তোমরা বাড়ি যাবে। তারপর তোমাদের যেতে হবে কলকাতায়। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, এই চিঠি নিয়ে যাবে। সেখান থেকে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে করাচীতে। চিঠিখানা একটু টাইপ করতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।

আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন আদালতে। সাহেব মাঝখানে। তাঁর দু'পাশে আমরা দু'জন।

পথের দু'পাশে লোকজন সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। দুটি বাঙালী ছেলের হাতে ধরে সাহেব চলেছেন হেঁটে। সেকালে, এটা দেখবার মত একটা দৃশ্যই বটে।

আদালতের সুমুখে যখন এসেছি, একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো আমাদের পাশে। তাকিয়ে দেখি, মোটরে বসে আছেন রায়-সাহেব। আমার মাতামহ।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। যাঁকে না জানিয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছি, তিনিই একেবারে চোখের সুমুখে। রায়-সাহেব তখন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। কে জানতো যে আজই তাঁর এজলাসের দিন।

এস-ডি-ও সাহেবের দিকে তাকিয়ে রায়-সাহেব মনে হলো যেন আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, গুড মর্নিং! বলেই আর এতটুকু অপেক্ষা না করে ভেতরে চলে গেলেন।

আমি নজরুলের দিকে তাকালাম, নজরুল আমার দিকে। কি যে হলো আমরাই বুঝলাম। এস-ডি-ও সাহেব কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, He is Mr. Chatterjee, Rai Sahib, very very influential man of my sub-division. Do you know him?

আমার তখন গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন রকমে বললাম, ইয়েস।

নজরুল এ-সব ব্যাপারে একেবারে নাবালক। হঠাৎ বলে বসলো —হিজ গ্রাণ্ড ফাদার।

সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া! আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, হোয়াট?

সাত

বলেছি তো—দ্বার্কা (দ্বারকা) আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু তাতে কি, আমাদের ইয়ার-বন্ধুর সামিল। বাপ-ঠাকুর্দার লোহা-লক্কড়ের দোকান, আমাদের বাড়ির কাছেই বাড়ি। পড়ে আমাদের নীচের ক্লাসে, কিন্তু সমানে আড্ডা মারে আমাদের সঙ্গে। সাদা ধপ্ ধপ্ করছে গায়ের রং, সুন্দর চেহারা, হাসতে হাসতে আমার পাশে এসে বসে। তারপর চুপি চুপি বলে, চিঠি এসেছে।

জিজ্ঞাসা করি হয়ত—কার চিঠি ?

এবার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে আরও চুপি চুপি বলে, তার—বো-এর।

বণিক-ব্যবসাদার মানুষ, বিয়ে ওদের একটু সকাল-সকালই হয়। ওর বিয়েতে আমরা সবাই গিয়েছিলাম বরযাত্রী হয়ে। বারো-তেরো বছরের দিব্যি ফুটফুটে সুন্দরী একটি বৌ—মস্ত বড়লোকের মেয়ে।

সেই বৌ তার বাপের বাড়ি থেকে চিঠি লিখেছে।

চিঠিখানি পড়ে বেশ ভাল করে তার একটি জবাব লিখে দিতে হবে আমাকে।

প্রথম-প্রথম রাজী হইনি লিখতে। ধমকে তাড়িয়ে দিয়েছি দ্বার্কাকে। তোর বৌ-এর চিঠির জবাব আমি দেব কি রে ?

কিন্তু তাড়ালেও যাবার ছেলে সে নয়।

—তাহলে দিলাম তোমার এই জামাটা ছিঁড়ে!

জামা ছেঁড়া বন্ধ করি তো মোটা একখানা বই টেনে নিয়ে বলে, এই অ্যাল্‌জ্যাব্রাটা নিয়ে গেলাম। কুয়োর ভেতর ফেলে দেবো।

তখন বাধ্য হয়ে বলতে হয়ঃ দে, দেখি তোর বৌ-এর চিঠি।

দেখবার একটা লোভও তো আছে! আমাদের বয়েসই-বা তখন কত!

চিঠি দেখে নজরুলের হাসি আর থামে না কিছুতেই!

'বানান ভুলের ছড়াছড়ি আর উল্‌টো-পাল্‌টা কথা। এই যেমন— 'তুমি ভাল আছ। আমি কেমন আছি।'

দ্বার্কা এবার রাগ করে। সত্যি তার রাগ করবার কথাই। বলে, হাসি থামাবে? তোমাদের বিয়ে হোক, দেখব কেমন পণ্ডিত-বৌ হয়।

চিঠি লিখবার কাগজ একখানি সঙ্গে এনেছিল দ্বার্কা। রঙিন কাগজ, দেখতে ভারি সুন্দর। বাঁদিকের কোণে একটি পাখির ছবি। পাখির ঠোঁটে একটি খাম, আর তার নীচে সোনালী অক্ষরে ছাপা দু'লাইন কবিতা—

যাও পাখি বোলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে।

নজরুল বললে, এবার লেখো তুমি। আমি যাই।

বলেই সে আবার ফিরে দাঁড়াল হাসতে হাসতে। হাত বাড়িয়ে বললে, দেখি দেখি চিঠির কাগজটা।

দ্বার্কা দেবে না, নজরুলও ছাড়বে না। দেখবেই।

শেষ পর্যন্ত কাগজটা কেড়ে নিয়ে নজরুল পড়লে—

যাও পাখি বোলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে।

তারপর বললে, এর নীচে লিখে দাও—

—চিঠিখানা লিখে দেছে শৈল,
বোলো না কাউকে যেন এ-দিব্যি রইল।

বলেই সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

দ্বার্কা বললে, বাঁচা গেল। নাও এবার লেখো।

লেখো বললেই লেখা যায় না। নব-বিবাহিতা তরুণী স্ত্রীর কাছে লিখবে তার যুবক স্বামী। অথচ স্বামী কিছুই বলছে না।

বলবে না জানি। কারণ এ আজ নতুন নয়। এই দুঃসাধ্য কর্ম এর আগেও আমাকে বারকতক করতে হয়েছে।

হতভাগা কপি পর্যন্ত করবে না। তার হাতের লেখা নাকি তার বৌ-এর চেয়েও এক ধাপ নীচেয়। বৌ পড়তে পারবে না।

—তারপর? যখন ধরা পড়বি?

—পড়ি পড়ব। তুমি লেখো তো।

এই আমাদের দ্বার্কা।

সেদিন এস-ডি-ও'র চিঠি নিয়ে আসানসোল থেকে ফিরছি নজরুল আর আমি। রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই দেখি—দ্বার্কা দাঁড়িয়ে। ঠিক বেরিয়ে যাবার গেটটার পাশে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুই এখানে কি জন্যে রে?

সে-কথার জবাব না দিয়ে দ্বার্কা বললে, তোমরা যুদ্ধে যাবে?

—তুই জানলি কেমন করে?

দ্বার্কা বললে, শহরের সবাই জেনে গেছে। তোমাদের বাড়ি থেকে তিনজন চাকর বেরিয়েছে তোমাকে খুঁজতে। বাড়ি-বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। রায়-সাহেব তোমাদের দেখে এসেছেন আসানসোলে।

নজরুলের মুখের দিকে তাকালাম। সে মিটি মিটি হাসছে।

বললাম, তুমি হাসছো?

নজরুল বললে, তোমার এখনও ভয় করছে? কিন্তু এখন আর তোমাকে কেউ কিছু বলবে না—এই আমি বলে রাখলাম—দেখো।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। সুমুখে শহরে ঢোকবার পথ। পথের দু'পাশে তখন আলোর মালা জ্বলছে। সবে সন্ধ্যা নেমেছে আমাদের সেই কয়লাকুঠির দেশে।

পাশাপাশি চলেছি আমরা তিন বন্ধু। দ্বার্কা কথা বলছে না। তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে, কথা বলছিস না যে?

কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম তার মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। একেবারে টলটল করছে। আর সেই জলের ওপর রাস্তার আলো পড়ে চিক্ চিক্ করছে।

আলোর খুঁটিগুলো একটু দূরে দূরে। আবার আমারা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলেছি। এই অবসরে কোঁচার খুঁট দিয়ে দ্বার্কা তার চোখ দুটো চট্ করে মুছে নিলে। তার সে অশ্রুসজল চোখ আর দেখতে পেলাম না। কিন্তু যা দেখলাম তারও মূল্য বড কম নয়।

খানিক বাদে পথ চলতে চলতে দ্বার্কা আমার হাতটা চেপে ধরলে। বললে, কি এমন দুঃখু তোমার মনে, যার জন্যে যুদ্ধে যাচ্ছো?

বলতে বলতে গলাটা তার ধরে এল।

বললাম, দুঃখু না থাকলে কি যেতে নেই?

কোনও জবাব পেলাম না তার কাছ থেকে।

—তুই কি ভেবেছিস আমরা আর ফিরবো না কখনো?

তারও কোনও জবাব নেই।

ভাবছিলাম আজ আর বাড়ি ফিরব না। যেখানে হোক রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালেই পালাব রাণীগঞ্জ থেকে। নজরুলকে বললাম, চল—কালই চলে যাই কলকাতা।

নজরুল বললে, কলকাতায় যাবে থাকবে কোথায়?

থাকবার জয়গা অবশ্য আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়া চলবে না।

বংশীর বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখি, বংশী দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। বংশী বললে, চল আমিও যাব। দ্বার্কা নতুন বিয়ে করেছে, নইলে ওকেও সঙ্গে নিতাম।

দ্বার্কা চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে। সে যেন বোবা হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে লোক জড়ো হয়ে গেল বিস্তর। পানের দোকান ছেড়ে ভজুয়া পর্যন্ত এসে দাঁড়াল আমাদের দেখবার জন্যে।

ভজুয়া বললে, ঢুগিয়াকেও নিয়ে যাও বাবু, ব্যাটা আমাদের ভারি জ্বালাচ্ছে।

সত্যিই তো যে-লোক জ্বালাচ্ছে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার এত সহজ উপায় আর কি হতে পারে? যুদ্ধে যারা যাচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করছে—এই তাদের বিশ্বাস। এরা যখন 'আর ফিরে কোনদিনই আসবে না, তখন ঢুগিয়াকে কোনো-রকমে এদের সঙ্গে ঠেলে দিতে পারলেই—ব্যস, জঞ্জাল চুকে যাবে চিরদিনের জন্যে। মরে তো ওই ব্যাটাই আগে মরবে।

ঢুগিয়াকে দেখেছেন আপনারা শেকার-সাহেবের বাংলোয়। অস্থিচর্মসার লম্বা লিক্‌লিকে একটি ছোকরা। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। সেই ঢুগিয়া-ব্যাটাই মরবে আগে।

নজরুল হাসতে লাগল ঢুগিয়ার নাম শুনে। বললে, ওকে নেবে কেন ভজহরি?

ভজহরি বললে, নিতেও পারে বাবু, ব্যাটা দেখতে অমনি কিন্তু ওর হাড়গুলো ঠিক লোহার মত শক্ত। নিয়ে যান সঙ্গে করে, নিজের পয়সায় যাবে, না নেয় তো ফিরে আসবে।

ঢুগিয়ার কথা নিয়ে হাসাহাসি করছি, এমন সময় যা' ভয় করেছিলাম তাই হলো। আমাদের বাড়ির দু'জন চাকর—সীতুয়া আর নান্নু এসে দাঁড়াল সামনে। বললে, চলুন। বড়বাবু ডাকছেন।

আমি একাই যাচ্ছিলাম, নাম্নু নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনিও আসুন বাবু, আপনাকেও নিয়ে যেতে বললেন।

আসামীর মত গিয়ে দাঁড়ালাম রায়-সাহেবের কাছে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা দু,জনে—নজরুল আর আমি।

দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। মার্বেল ফ্লোরের ওপর দামী কাশ্মীরী কার্পেট পাতা। জানলার কাছটিতে যেমন তিনি প্রত্যহ বসে বসে কাজকর্ম করেন, সেদিনও তেমনি করছিলেন। নজরুলের দিকে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। বললেন বোসো।

দু'জনেই জড়সড় হ'য়ে বসলাম কার্পেটের ওপরে।

রায়-সাহেব কথা খুব কম বলেন। সেদিন মনে হলো যেন আরও বেশি গম্ভীর। তাঁর গায়ের রং ছিল খুব ফরসা। বুক পর্যন্ত লম্বা, দাড়ি দাড়িতে তখন সবেমাত্র পাক ধরছে। আমার দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না।

আবার তিনি নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনেছি তুমি খুব ভাল ছেলে, কিন্তু লেখাপড়া তো তোমার এইখানেই শেষ।

নজরুল জবাব দিলে না। তিনি আবার বললেন, তোমার বাড়ির অবস্থা ভাল নয় আমরা শুনেছি। তার ওপর বোধহয় তুমিই বাড়ির ছেলে। যাক্-গে, সে-সব ভাবনা তোমার।

এই বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, এই যে যুদ্ধে চলে যাওয়া—এটি বেরুলো কার মাথা থেকে?

নজরুল বলতে যাচ্ছিল, তার মাথা থেকে বেরিয়েছে। আমি তাকে থামিয়ে দিলাম, বললাম, আমার।

আমি চাইনি—নজরুলের ওপর রায়-সাহেবের ধারণা খারাপ হোক। চাইনি যে তিনি ভাবুন—এ-ব্যাপারে নজরুলের উৎসাহ আমার চেয়ে বেশী।

জবাব শুনে কি তিনি ভাবলেন বুঝলাম না।

বললেন, তাহলে কবে যাচ্ছ কলকাতায় ?

নজরুল বললে, পরশু।

বলেই নজরুল তার জামার পকেট থেকে এস-ডি-ওঁ সাহেবের লেখা খামের চিঠিখানা বের করে বললে, এই যে, দেখুন সাহেব লিখে দিয়েছে।

খামখানি রায়-সাহেব নিলেন হাতে করে। খামের মুখ বন্ধ। ম্লান একটু হেসে সেখানি তিনি তখনি আবার ফিরিয়ে দিলেন নজরুলের হাতে।

বললেন, হাওড়ায় নেমে সোজা তোমরা চলে যাবে সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। আমি একখানি চিঠি লিখে দেব। সেজবাবু সেখানে আছেন। তিনি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন রিক্রুটারের আপিসে।

বেঁচে গেলাম। রায়-সাহেব নিজে থেকেই সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

বললেন, যাও। লেখাপড়া তো চুকিয়ে দিলে। এখন তোমরা স্বাধীন। যা খুশি তাই করগে।

বুঝতে পারিনি মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারছে।

বুক ফুলিয়ে হাসতে হাসতে আমরা নীচে নামছি, পেছন থেকে মনে হলো যেন মামীমা ডাকছেন। বলে গেলাম, আসছি।

মেয়েদের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতে তখন লজ্জা করছে। পাশ কাটিয়ে ভাবলাম পালিয়ে যাই নজরুলের বোর্ডিং-এ। কিন্তু রাস্তায় গিয়ে নামতেই দেখি—সুমুখে দুগিয়া। দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে। এমন পান খেয়েছে যে, মুখের দু'কস্ বেয়ে লালচে রস গড়াচ্ছে। হাসতে হাসতে বললে, আমি শুনেছি।

—কি শুনেছিস ?

দুগিয়া বললে, আমাকে না নিয়ে গেলে যেতে দেব না।

—তোকে নেবে না যে !

—না নেয়, আমি ফিরে আসবো।

তার পরেই চললো তার পায়ে ধরা আর কান্না। নিয়ে তাকে যেতেই হবে। আমাদের কাছে থেকে প্রতিশ্রুতি সে আদায় করে নিয়ে তবে ছাড়লে।

নজরুল চলে গেল তার বোর্ডিং-এ আর আমি গেলাম বাড়ির ভেতর। মামীমা ডেকেছেন—যেতেই হবে।

চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়ালাম মামীমার কাছে। আমার একখানা হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, এ কী করলি ?

হাতটা তাঁর থর্ থর্ করে কাঁপছে। আমিও তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাব বলেই পালাতে চেয়েছিলাম কাউকে কিছু না জানিয়ে।

হঠাৎ আমার হাতটা মামীমা ছেড়ে দিলেন। মুখ তুলতেই দেখি রাঁধুনি বামনী মোক্ষদা এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে দোর আগলে !

বাংলা দেশের অনেক কবি অনেক সাহিত্যিক নারীজাতির গুণ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা বোধহয় আমাদের এই মোক্ষদাকে দেখেননি, দেখলে কলম তাঁহাদের নিশ্চয়ই থেমে যেত, এতখানি প্রাণ খুলে কলম চালাতে পারতেন না।

মোক্ষদা বলতে আরম্ভ করলে, আহা বাছা রে ! নড়াই-এ নাম নেখাতে গেলি কোন্ দুঃখে বল্ দেখিনি ? মাঠে-ঘাটে মরে পড়ে থাকবি, শেয়াল-শকুনিতে ছিঁড়ে খাবে !

মামীমা বললেন, আঃ, থামো।

কিন্তু থামা দূরে থাক, মোক্ষদা এবার সত্যি-সত্যিই চোখে কাপড় চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।—এই এতটুকু ছেলেকে এত বড়টি করে তুললে গো, আর সেই ছেলে কিনা আজ জন্মের মতন চলে যাচ্ছে সবাইকে ছেড়ে—

সে রীতিমত কান্না শুরু করে দিলে।

আমি ছাড়া সকাল-সকাল ভাত খাবার লোক বাড়িতে কেউ ছিল না। আমাকেই শুধু ইস্কুলের ভাত ওকে রান্না করে দিতে হতো। তাই আমি ছিলাম মোক্ষদার দু'চক্ষের বিষ। ইস্কুলের ভাত আর রাঁধতে হবে না—এই আনন্দেই বোধহয় সে এই মড়াকান্নার অভিনয় করে লোক জড়ো করে ফেললে।

মামীমা আর আমি দু'জনেই তখন ঘরের তেতর আট্‌কা পড়ে গেছি। কারণ মোক্ষদা তার বিরাট দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোরের ঠিক মাঝখানটিতে।

মামীমাই প্রথমে তাকে একটু সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার পিছু পিছু আমিও একটু খানি পথ করে নিলাম।

রাণীগঞ্জে রইলাম মাত্র একদিন। এই একটি দিনের স্মৃতি আমি কখনও ভুলবো না। পৃথিবীতে থাকবার মেয়াদ আমাদের শেষ হয়ে গেছে—এই কথাটি আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সকলের সে কি আপ্রাণ চেষ্টা। বুঝবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওইটিই আমি চেয়েছিলাম। কেন চেয়েছিলাম—জীবনের প্রতি এ বিতৃষ্ণা আমার কেন এসেছিল—সে কাহিনী এখানে অবান্তর।

নজরুলের জীবনের নিগূঢ়তম বেদনার কাহিনীও আমি জানি। সেই বেদনার সঙ্গে মিশেছিল কৈশোরের দুদমনীয় অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি। তাই সব-কিছু হাসিমুখে পরিত্যাগ করে সেও ঝাঁপ দিয়েছিল এই মারণ-যজ্ঞে।

আমাদের দু'জনের প্রীতির বন্ধন নিবিড়তর হতে পেরেছিল বুঝি সেই কারণেই। এই সহানুভূতির জন্যই বোধকরি এক আর একের যোগফল দুই না হয়ে হয়েছিল এক। অঙ্ক শাস্ত্রের চিরসত্য ফর্মূলাকে উল্টে দিয়ে।

আমার পাতানো দিদি আর যতীন, নজরুলের ছিনু আর আমার দ্বারকা—কিছুতেই পেছনে টেনে রাখতে পারলে না আমাদের। যারা পারত, আমার মাতামহী আর নজরুলের মা—তারা রইল

দূরে। নিষ্ঠুরতম ঔদাসীন্যে তাদের সঙ্গে দেখা না করে শুধু তাদের স্মৃতির আগুন বুকে জ্বালিয়ে নিয়ে আমরা একদিন ট্রেনে চড়ে বসলাম সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে। ভুগিয়া হাসতে হাসতে এসে বসলো আমাদের সঙ্গে। তার মা দাঁড়িয়ে রইল ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে। ভুগিয়ার মত এক সর্বহারা পাষাণের চোখেও দেখলাম অশ্রুর ধারা।

আমাদের চোখ ছিল শুকনো। পাশাপাশি বসে হাসছিলাম আমরা—নজরুল আর আমি। সে হাসিও প্রাণোত্তাপে সজীব নয়। দেবতার প্রতি নিদারুণ অভিমানে যে আগুন জ্বালিয়েছিলাম আমাদের বুকে, তারই উষ্ণ উত্তাপে বোধকরি উত্তাল অশ্রুসমুদ্র শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় পৌঁছলাম পরের দিন সকালে। এর আগে নজরুল কখনও কলকাতা দেখেনি। বললাম, ছু' চোখ ভরে দেখে নাও। আর হয়ত দেখতে পাব না।

নজরুলের, কেন জানি না, দৃঢ় বিশ্বাস সে আবার ফিরে আসবে। বললে, না না এত তাড়াতাড়ি মরব না আমরা।

আমাদের যেতে হবে সুকিয়া ষ্ট্রীটে। (আজকাল কৈলাস বোস ষ্ট্রীট) একাত্তোর নম্বর বাড়িখানি উখরার জমিদারদের। রায়-সাহেবের কোনও বাড়িই তখন হয়নি কলকাতায়। উখরা এষ্টেটের সঙ্গে তখন আমাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাজেই ওই এক বাড়িতেই আমাদের ছু'বাড়ির কাজ চলতো।

কলেজ ষ্ট্রীটে ট্রাম বদল করবার জন্যে নেমেছি, দেখি আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে লোক দাঁড়িয়ে আছে। রায়-সাহেবের টেলিগ্রাম এসে পৌঁচেছে আমাদের আগেই।

সেখানে গিয়ে দেখি আমার মামা, উখরার সেজমামা এবং আরো অনেকেই বসে আছেন আমাদের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে।

উখরার সেজমামা (শৈলবিহারী লাল সিং হাণ্ডে) আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, খুব দেখালি বাবা।

আমার মামা একটি কথাও বললেন না। শুধু একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মা আর এই মামা—রায়-সাহেবের দুই ছেলেমেয়ে। আমার মা অনেকদিন আগেই চলে গেছে আমাকে রেখে। আমি তখন নিতান্তই ছোট—আমার সেকথা মনে নেই, কিন্তু মামা বোধকরি ভুলতে পারেননি সেকথা।

বেশ কিছু পরে কথা বললেন তিনি। বললেন, সব দিলে তো শেষ করে! খুব বাহাদুর! কই, এস-ডি-ওর চিঠি কার কাছে? দেখি।

নজরুল তার পকেট থেকে খামের চিঠিখানি বের করে দিলে।

মামা বললেন, রাত জেগে ট্রেনে এসেছ, যাও এবার স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুমোওগে। বিকেলে নিয়ে যাব রিক্রুটিং আপিসে।

রাত জেগে এসেছি, সত্যিই তো, চোখ জ্বালা করছে। ভেবেছিলাম, স্নান করলেই ঘুমে চোখ ভ'রে আসবে। কিন্তু কোথায় ঘুম? ছাড়পত্র নিয়ে বোধকরি সে অন্যদেশে পাড়ি জমিয়েছে।

দুগিয়া বসে বসে পা টিপছে। বারণ করলেও শোনে না। বলে, আমাকে ফেলে যেন তোমরা চলে যেও না।

দুগিয়ার সঙ্গে মজার মজার গল্প করেই সময়টা কেটে গেল।

হেদোর উত্তর দিকের লাল বাড়িতে মল্লিক-সাহেবের রিক্রুটিং আপিস। মামা আর সেজবাবু সেখানে নিয়ে গেলেন।

খাতায় নাম লেখানো হলো। দুগিয়াও বাদ গেল না। তার নাম উঠলো 'সুইপারের' খাতায়। দুগিয়ার তাতে আপত্তি নেই। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'সুইপার' মানে?

আমি বললাম, ঝাড়ুদার।

নজরুল হাসতে হাসতে বললে, মেথর।

দুদিয়ে বললে, তা হোক।

তবু সে যাবে।

তার পরেই পরীক্ষার পালা।

আর একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো নজরুলকে আর আমাকে। ছুগিয়ার পরীক্ষার দরকার নেই।

পরীক্ষা যৎসামান্যই। কত ফুট লম্বা, কত ওজন, বুকের ছাতির মাপ কত।

প্রথমেই নজরুল উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

যিনি মাপ নিচ্ছিলেন তিনি বললেন, বসুন ওই বেঞ্চে। এক্ষুনি আপনাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে ফোর্ট উইলিয়ামে। সেখানে সাজ-পোশাক, বিছানা আর কিড-ব্যাগ দেওয়া হবে। তারপর যেদিন টার্ন আসবে, সেইদিন রওনা হতে হবে নওশেরা।

মামা এইবার আমাকে এগিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক লিখে চলেছেন খাতায়। লম্বা—ঠিক আছে। ওজন—ঠিক আছে। শেষে এসে দাঁড়ালাম, ফিতে দিয়ে যিনি বুকের মাপ নিচ্ছিলেন, তাঁর কাছে। একবার মাপলেন, দু'বার মাপলেন, আবার মাপলেন, তারপর বললেন, আধ-ইঞ্চি কম। আন্‌ফিট।

যিনি খাতা লিখছিলেন, তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বেশ আদুরে গলায় বললেন, বাড়ি চলে যান। দিন কতক খুব সাঁতার কাটুন, তারপর বুকের মাপ ঠিক হয়ে গেলে আবার এপ্লাই করবেন।

বলেই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হাঁকলেন, নেক্সট্।

মামা তখন আমার হাতখানা চেপে ধরেছেন। ওদিকে নজরুল উঠে দাঁড়িয়েছে।

'এ কি হলো?

নজরুল এগিয়ে এসে বললে, সে কি? মাপে নিশ্চয়ই ভুল। হ'য়েছে তোমার বুকের ছাতি তো—

মামা বললে, তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

তারপর যা হলো তা আর লিখবার নয়। নজরুলের মুখের দিকে শুধু একবার তাকিয়ে ছিলাম মনে আছে।

তার সে শুকনো চোখেও সেদিন একটুখানি জল দেখেছিলাম। আর আমার চোখে তখন অশ্রুর বন্যা নেমেছে।

মামা আমাকে সেখান থেকে জোর করে টেনে আনলেন। বললেন, থাক—খুব হয়েছে! এবার এসো।

আট

যার যাবার কথা নয় সেও চলে গেল। তালপাতার সেপাই ত্রুগিয়া চলে গেল সুইপার হয়ে।

পেছনে পড়ে রইলাম আমি।

দুঃখ যত-না হলো লজ্জা হলো তার চেয়ে অনেক বেশি। রাণীগঞ্জে আমি ফিরে যাব কোন্ মুখে ?

সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায় এসে নিশ্বাস টেনে টেনে বুকের ছাতিটা বার-বার ফুলিয়ে-ফুলিয়ে দেখতে লাগলাম।

দর্জির কাছে গিয়ে ফিতে দিয়ে মেপে দেখলে হয়।

উখরার সেজমামার মুখে হাসি দেখে মনে কেমন যেন সন্দেহ হলো। এঁদের কারসাজি নয় তো ?

কিন্তু তখন সব শেষ। আর কোনও উপায় নেই। আমি তখন সন্দেহাতীতভাবে নজরবন্দী।

বারান্দায় বসে বসে রাস্তায় লোক দেখছি। পাশের ঘরে তুমুল হট্টগোল চলছে। তিন জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।—তার ভাষা নিয়ে উঠেছে তর্ক। Sailaja exempted হবে, না released হবে, disqualified হবে, না unfit হবে—ঠিক হচ্ছে না কিছুতেই।

সেই ফাঁকে, একবার ভাবলুম পালাই। তখনও যদি নজরুলকে ফোর্ট উইলিয়ামে না পাঠিয়ে দিয়ে থাকে তো চট্ করে একবার দেখা করে

ছুটো কথা বলে আসি। বলে আসি—একা একা তোমার যদি ভাল না লাগে তো পালিয়ে এসো ওখান থেকে। পালিয়ে আসবার যদি উপায় না থাকে তো রোজ একখানা করে চিঠি লিখো। আমিও লিখব।

পা টিপে টিপে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িতে যেই পা দিয়েছি, পিছন থেকে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

বললাম, রাস্তায়। একটু ঘুরে আসি।

সেজবাবু বললেন, না। বিকেলে আমার সঙ্গে বেরুবে। বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনব।

তাই হলো শেষ পর্যন্ত। সারাদিন বন্দী হয়ে রইলাম বাড়ির ভিতর। বিকেলে ট্রামে চড়ে চললাম চৌরঙ্গীর দিকে। চারিদিকে সতর্ক প্রহরী। জানলার ধারে চুপটি করে বসে আছি। রাস্তার ধারে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় দোকান। লোকজনের যাওয়া-আসার বিরাম নেই। কলকাতায় তখন এত লোকও ছিল না, এত গাড়িও না। তবু ক্রমাগত মনে হতে লাগল—এই জনারণ্যে আমি যেন আমার প্রিয়তম বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছি।

ট্রাম গিয়ে দাঁড়াল চৌরঙ্গীতে। আমাদের নামতে হবে।

সুমুখে গড়ের মাঠ। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটা শুনেছিলাম এইদিকেই কোথায় যেন আছে। সেজবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, দুর্গটা কোথায় ?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, সেখানে গেলেও এখন আর দেখা করতে দেবেনা। মিলিটারি আইন ভারি কড়া।

এই বলে তিনি আমাকে অনেক কিছু বোঝালেন। বললেন, এখন তোমার লেখাপড়া শেখবার বয়েস। রাণীগঞ্জে ফিরে যাও, গিয়ে যাতে ভাল করে পাশ করতে পার, তার চেষ্টা করগে।

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ধরে আমি চলেছি। যাব গ্লোব থিয়েটারে। তখন 'বিজু' না ওই রকম কি একটা নাম ছিল ওর। মামা একটু দূরে দূরে চলছিলেন। গ্লোবে ঢোক বার দোরের কাছটাতে দাঁড়িয়ে একটা কথা তিনি বলেছিলেন,—যা আমার আজও মনে আছে। বলেছিলেন, ইংরেজ আমাদের যুদ্ধ-বিত্যা শিখিয়ে দেবে—এই কথাটা কে ঢোকালে তোদের মাথায় ?

জবাব দিতে পারিনি। মাথা হেঁট করে তাঁদের সঙ্গে ছবিঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মনে আছে—ছবিটা ছিল নাজিমোভার। আর ছিল তখনকার দিনের টাইটেল্ ভারাক্রান্ত নীরব ছবি। সবকিছু লং-শটে তোলা।

পা-কাটা ছবি চলে-ফিরে বেড়াবে, কাটামুণ্ডু কথা বলবে—তখনকার মানুষ সেকথা ভাবতেও পারতো না। ক্লোজ্-আপ্ মিড্শটের যুগান্তকারী আবিষ্কর্তা গ্রিফিথের আবির্ভাব তখনও হয়নি।

এক বর্ণও বুঝতে পারিনি ছবিটা। বুঝবার যে চেষ্টাও করেছিলাম তাও না। আমার মন তখন পড়ে আছে ফোর্ট উইলিয়ামে। বারম্বার শুধু সৈনিকের বেশে কল্পনা করছি নজরুলকে। ভাবছি রাণীগঞ্জ স্টেশনে একখানা ট্রেন গিয়ে দাঁড়াল। দুটো কামরা বাঙালী পল্টনে ঠাসা। তাদের ভেতর থেকে খাকি হাফ্প্যান্ট-পরা তরুণ নজরুল বেরিয়ে এল। বন্ধুরা এসেছে বিদায় অভিনন্দন জানাতে। হয়ত-বা সারা রাণীগঞ্জ শহর ভেঙে পড়েছে সেখানে।

কিন্তু আর-একজন কোথায় ? রাণীগঞ্জ ছেড়ে যে চলে গেল বুক ফুলিয়ে ? সেই শৈল ?

কী জবাব দেবে নজরুল ?

বলবে হয়ত তার বুকের ছাতি আমার মত চওড়া নয়, তাই সে

পড়ে রইল পিছনে। আমি একাই চললাম। সে আবার ফিরে আসবে রাণীগঞ্জে।

আমি কিন্তু রাণীগঞ্জে আর ফিরলাম না। ফিরতেও পারলাম না।

কলকাতা থেকে আমাকে একা আসতে দিলে না। সঙ্গে একজন লোক এলো।

যে এলো তাকে আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ফিরিয়ে দেবার অনেক-রকম কসরত করলাম। কিন্তু পারলাম না ফেরাতে। সে যাবেই। রাণীগঞ্জে আমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে ফিরবে। নইলে নয়।

ট্রেনে চড়ে বসলাম দু'জনে। লোকটি আমাকে খুব তোয়াজ করতে লাগল।— 'বিড়ি-সিগ্রেট খাও যদি তো খেতে পারো, আমি কাউকে কিছু বলব না।'

কিছুই তখন আমার ভাল লাগছে না। পৃথিবীটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে।

রাণীগঞ্জে গাড়িটা পৌঁছোবে ঠিক বিকেল চারটেয়। দিনের বেলা কিছুতেই আমি সেখানে যেতে পারব না। সুতরাং যে-লোকটি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব।

শেষ পর্যন্ত সম্ভব একটা করে বসলাম। রাণীগঞ্জের আগের ষ্টেশন অণ্ডাল। গাড়িটা অণ্ডালে এসে যেই দাঁড়িয়েছে, চট্‌ করে আসছি বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। ছুটে পালালে সন্দেহ করবে তাই আস্তে আস্তে পা বাড়ালাম।

সঙ্গী ভদ্রলোক বললে, দেরি কোরো না। গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।

বললাম, আচ্ছা।

সত্যিই দাঁড়াল না। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে, তখন আমি প্ল্যাটফর্মের ওপর একটুখানি দূরে দাঁড়িয়ে।

দোরের কাছে মুখ বাড়িয়ে ভদ্রলোক চীৎকার করতে লাগল ঃ ওঠো, ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো।

চেঁচিয়ে বললাম, উঠবো না। আমি অণ্ডাল গ্রামে যাচ্ছি। আপনি বলে দেবেন।

তার মুখের চেহারা কিরকম হলো দেখবার অবসর পেলাম না। গাড়িটা ধীরে ধীরে তখন বেগ নিয়ে অনেক দূরেচলে গেছে।

আমার টিকিটখানা রয়ে গেল তার পকেটে। কালেক্টার টিকিট চাইলে কি বলব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম। অণ্ডাল স্টেশন তখন এত বড় ছিল না। কখন যে স্টেশনের বাইরে চলে এসেছি বুঝতেও পারিনি।

নিঃসঙ্গ একাকী এক তরুণ বালক—মহাযুদ্ধে সৈনিক হবার বাসনা নিয়ে কলকাতা গিয়েছিল তিনদিন আগে। ফিরে এলো আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে। সেই বেদনার সুস্পষ্ট চিহ্ন বোধ হয় পড়েছিল তার সর্ব অবয়বে।

—কি গো, কি ভাবতে ভাবতে চলেছ অমন করে?

তাকিয়ে দেখি, অণ্ডাল গ্রামের একজন লোক। বললে, ফিরে এলে তাহলে?

বুঝলাম খবরটা এ গ্রামেও এসে পেঁ ছেছে।

বললাম, হ্যাঁ গোবিন্দ, ফিরেই এলাম।

গোবিন্দ বললে, জানি তুমি ফিরে আসবে। অত বড় দাদামশাই, যেমন করেই হোক ছাড়িয়ে আনবে।

যে যা ভাবে ভাবুক। কথাটার জবাব দিলাম না।

নীরবে পথ চলছিলাম। দেখি না গোবিন্দ আমার পিছু নিয়েছে। তার কৌতূহলের সীমা নেই। বললে, ইংরাজরা নিশ্চয়ই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে। না, কি বল?

আর চুপচাপ থাকা গেল না। কথা বলতে হলো। বললাম, না। হারবে কেন?

আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় গোবিন্দ। আমাকে জন্মাবধি চেনে। জাতে ময়রা। আমার কথাটা সে বিশ্বাস করলে না। বললে, লেখাপড়া জানি না, কিন্তু বুঝি সব। মানুষের টান পড়েছে বাবু, জার্মানীরা মেরে সব সাবাড় করে দিয়েছে। • তা নইলে তোমাদের মতন কচি ছেলেগুলোকে ইস্কুল থেকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

অনেক করে তাকে বুঝিয়ে বললাম, তুমি ভুল বলছ গোবিন্দ, আমাদের টেনে নিয়ে যায়নি। আমরা গিয়েছিলাম নিজেরাই।

কিন্তু বোঝাব কাকে?

পরাধীন জাতির মর্মমূলে ইংরেজ-বিদ্বেষ তখন এমনি পুঞ্জীভূত যে, গোবিন্দের মত নিতান্ত সাধারণ গ্রামের একজন অশিক্ষিত মানুষও মনে মনে কল্পনা করছে—জার্মানীর হাতে ইংরেজের লাঞ্ছনার অন্ত নেই। ইংরেজ জাতটা মরে শেষ হয়ে এলো। আমাদের কি হবে সে-সব পরের কথা, এখন ইংরেজ তো মরুক!

সারাটা পথ গোবিন্দ আমাকে নানান তত্ত্বকথা শোনাতে শোনাতে চললো। ইংরেজ যে আমাদের ভাল কিছু করতে পারে, বাঙালী যে পলটন হতে পারে—সে-সব কথা তার ধারণার অতীত। রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা সে রামায়ণে শুনেছে। শ্রীরামচন্দ্রের হাতে রাবণের গুষ্টি যখন সাবাড় হয়ে গেছে, যুদ্ধ করবার মত একটি লোকও যখন আর লঙ্কায় পাওয়া যাচ্ছে না, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে রাবণ তখন তার চৌদ্দ-বছরের ভাইপো তরণীসেনকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল।

গোবিন্দর কাছে আমাদের যুদ্ধে যাওয়াটাও ঠিক যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ।

তার পরেই এলো তার অভাব-অভিযোগের কথা। ভারতবর্ষ তখন ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় পরছে। আমেদাবাদ তখনও জন্মগ্রহণ করেনি।

গোবিন্দ বললে, রেলি ব্রাদার্সের একজোড়া শাড়ির দাম যখন ছ' টাকায় উঠেছে, তখনই বুঝেছি ইংরেজ আমাদের ন্যাংটো করে রাখার কুমতলব আঁটছে।

গোবিন্দর ধারণা, ইংরেজ যে মরছে, সে শুধু এই পাপে। আমাদের মত ধর্মপ্রাণ একটা জাতিকে বিনা অপরাধে কষ্ট দিলে ভগবান সহ্য করবেন না। করছেনও না। ইংরেজ মরবে।

ইংরেজ মরবে কিনা জানি না, তবে আমি যে মরেছি সে কথা বুঝতে দেরি হলো না।

পরের দিন সকালেই দেখি, কালো ঘোড়ার জুড়ি-গাড়িটা অণ্ডালের বাড়ির সদরে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে নামলেন রায়-সাহেব।

দোতলার ঘরে বসে গল্প করছিলাম অবনীর সঙ্গে। অবনী রায়-সাহেবের ছোট ভাই-এর ছেলে। সম্পর্কে মামা হলেও জীবনে কোনোদিন তাকে মামা বলে ডাকিনি। এক বয়স দু'জনের, একই সঙ্গে পাশাপাশি থেকে মানুষ হয়েছি, এক সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছি।

অবনী বললে, ওই এলেন। তোকে ধরে নিয়ে যেতে বোধহয়। চল পালাই।

পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। প্রকাণ্ড বাড়ি। ছাতের সিঁড়িতে গিয়ে বসে রইলাম। রায়-সাহেব কি বলেন শুনতে হবে।

অবনী বললে, কেন মরতে গেলি ওইসব করতে? আমি বাবা রায়-সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কিছুতেই যেতে পারব না এক-গাড়িতে। তুই যাবি তো যা।

আমি বললাম, আমি যাব না রাণীগঞ্জে।

—পড়বি না?

—না। পড়তে হয় অন্য কোথাও ভর্তি হব।

সিঁড়ির একপাশে গায়ে গা দিয়ে বসে আছি দু'জনে। চুপি চুপি

কথা বলছি ফিস্ ফিস্ করে। এমন সময় রায়-সাহেবের জুতোর আওয়াজ শোনা গেল সিঁড়ির ওপর। সম্ভবতঃ দোতলায় উঠছেন।

হঠাৎ রায়-সাহেব চীৎকার করে উঠলেন, কোথায় সে নবাব-সাহেব, কোথায় গেলেন ?

বুঝলাম, দিদিমা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে।

রায়-সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তাঁর কথা বেশ শুনতে পাচ্ছি। বলছেন, শুনেছ তো নাতির কীর্তি-কাহিনী ?

দিদিমার কথা শোনা গেল না। হয়ত বা কিছুই বলেননি। হয়ত-বা তিনিও ভয় পেয়ে গেছেন।

রায়-সাহেব বললেন, ইস্কুলের টিচাররা বলে ছেলেটা ভাল। ভেবেছিলাম, লেখাপড়া শেখে তো বিলেত পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আর কোনও আশা নেই। কতকগুলো বখাটে বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একেবারে জাহান্নামে গেল।

অবনী বলে উঠল, ঠিক বলেছ। আমিও ঠিক সেই কথাই বলি।

অবনী আমাকে হাসাবার চেষ্টা করছে। বললাম, চুপ কর। জোরে হেসে ফেলবো।

বলেই আবার কান পেতে রইলাম রায়-সাহেবের কথাগুলো শোনবার জন্যে। তিনি বললেন, কলকাতা থেকে আসছিল, সঙ্গের লোকটাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে অণ্ডালে নেমে পড়েছে। ভাবলাম বুঝি আবার পালালো। তাই সকালেই ছুটে এলাম।

বলতে বলতে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন তিনি। আর একটি কথাও শোনা গেল না।

অবনী তখন আবার আরম্ভ করেছে আমাকে খোঁচা মারতে। —এবার কি করবি ? খুব যে লাফাচ্ছিলি যা : না বলে।

বললাম, সত্যি বলছি আমি যাব না। চল্ এখান থেকে পালাই।

পা টিপে টিপে সত্যিই পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। বললাম, গাঁয়ের ভেতর কারও বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকিগে চল্। খুঁজে পাবে না তাহলে।

অবনী তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। কারণ আমাকে যেতে হলে তাকেও যেতে হবে। অথচ কিছুদিন থেকে পড়াশোনা তার একদম ভাল লাগছে না। একদিন ইস্কুলে যায় তো দশদিন যায় না। থার্ড মাস্টার একদিন বলেছিলেন, কানে হাত দিয়ে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাকো। ব্যস্, সেইদিন থেকে স্কুল যাওয়া বন্ধ। সেই থেকে বসে আছে এই অঞ্চলে।

সেদিন আমরা বাড়ি যখন ফিরলাম, রায়-সাহেব তখন চলে গেছেন। রায়-সাহেব চলে গেছেন, কিন্তু বাড়ির ভিতর একটা হৈ-হৈ কাণ্ড!

যাদের সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। রায়-সাহেব নাকি আমার ওপর এমন রাগ রেগেছেন যে, দেখতে পেলে দু'টুকরো করে কেটে ফেলবেন।

সত্য খবরটা পেলাম দিদিমা'র কাছে গিয়ে। বললেন, পালিয়ে না গেলেই পারতিস।

জিজ্ঞাসা করলাম, উনি খুব রেগেছেন?

—রাগবে না? একবার দেখা পর্যন্ত করলি না।

বললাম, দেখা করলে যে সঙ্গে করে ধরে নিয়ে যেত।

দিদিমা বললেন, তবে কি তুই ভেবেছিস রাণীগঞ্জে যাবি না? লেখাপড়া করবি না?

না না তা কেন, তুমি কি বললে তাই বল।

দিদিমা বললেন, বললাম, এখন ওর মন-টন খারাপ, দু'দিন পরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

বাঁচা গেল।

কিন্তু সেই দু'দিন আর পার হতে চায় না কিছুতেই।

রাণীগঞ্জ যেতে আর মন চাইছে না। অথচ পড়া ছেড়ে দেবো সেকথা ভাবতেও পারছি না।

অবনীর সঙ্গে হৈ হৈ করে দিনগুলো কাটছিল মন্দ নয়। এমন দিনে হঠাৎ একদিন দুপুরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যে কথা তখন একেবারেই ভাবছিলাম না, পিওন আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। খামের ওপরে হাতের লেখা দেখেই চিনতে পারলাম। নজরুলের চিঠি। টিকিটের ওপর কোন্ পোষ্টাপিসের ছাপ ঠিক পড়তে পারলাম না।

চিঠিখানা পড়লেই তো ফুরিয়ে যাবে। খুললাম না। চিঠিখানা পেয়েছিলাম স্নান করবার আগে। ভাবলাম স্নান করে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একা বসে বসে আমেজ করে পড়বো।

তখন আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল রবীন্দ্রনাথের একখানি কবিতার বই। অণ্ডালের বাড়িতেই সেখানি রেখে দিয়েছিলাম সেই বই-এর ভেতর চিঠিখানা রাখতে গেলাম।

রাখতে গিয়ে আর লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। স্নান করব, তারপর খাব, তারপব অবনীর কাছ থেকে চুপি চুপি সরে গিয়ে একা বসে বসে পড়ব, সে তো অনেক দেরি।

খামের মুখখানা ছিঁড়তে গিয়ে দেখি, রাণীগঞ্জের ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে সে সোজা অণ্ডালের ঠিকানা লিখেছে খামের ওপর।

নজরুল জানলে কেমন করে যে আমি অণ্ডালে আছি?

জানা অবশ্য শক্ত কিছু নয়। সেও যদি ঠিক আমার মত ফিরে আসতো, রাণীগঞ্জে থাকা তার পক্ষেও সম্ভব হতো না। হয় সে তার পুরুলিয়া গ্রামে গিয়ে বসে থাকত, আর নয়-তো অন্য কোথাও পালাতো।

খামটি খুলেই দেখি—বেগুনি রঙের কালিতে লেখা এক চিঠি।

প্রতিদিনের প্রতিটি কথা সে রসিয়ে রসিয়ে লিখেছে। প্রথমেই লিখেছে, তোমার অভাবে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে সত্যি, কিন্তু ভালই

হয়েছে তুমি আসনি। মিলিটারি আইন-কানুন ভারি কড়া। তুমি সহ্য করতে পারতে না। আমার কথা ভাবছ? এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছি জীবনে। এ আমার গা-সওয়া হয়ে যাবে দু'দিনেই।

ভারি সুন্দর একটা গল্পের প্লট এসেছে আমার মাথায়। কখন লিখব এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। লেখা হলেই তোমাকে জানাবো।

'তারপর অনেক কথার পর তুগিয়ার কথা লিখেছে দু'লাইন। ব্যাটা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে দেওয়া হয়েছে কিচেনে। ভাব করে ফেলেছে সবাইকার সঙ্গে। কিন্তু যেদিন চুরি করবে, সেইদিন বুঝবে মজা! দাঁত বের-করা হাসি ওর বেরিয়ে যাবে।

শেষে লিখেছে—জায়গাটা কিন্তু ভারি সুন্দর।

নয়

নজরুলের প্রথম চিঠির জবাব দিলাম।

জবাবটি লিখতে আমার চারদিন লেগেছিল। চারদিন না বলে চার রাত্রি বলাই উচিত। কারণ দিনের বেলা নজরুলকে চিঠি লিখতে আমায় ভাল লাগতো না। নিশুতি রাত্রে সারা গ্রাম যখন ঘুমিয়ে পড়ত, আণ্ডালের বাড়ির দোতলার শিয়রের কাছে বড় জানলাটা খুলে দিয়ে লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় শুয়ে শুয়ে নিবিষ্টমনে চিঠি লিখতাম।

এবার সবই আমার নিজের কথা। সে-সব কথা নাই-বা শুনলেন! পরে যদি কোনদিন শুনতে চান তো শোনাব সে ছন্নছাড়া জীবনের এক রহস্যময় ইতিকথা। এমন যতটুকু না বললে নয় ততটুকু বলি!

রাণীগঞ্জ থেকে ক্রমাগত তাগিদ আসছে। লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম কি না সেই কথাই জানতে চান রায়-সাহেব—আমার দাদা-মশাই।

সুতরাং এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

নজরুলের চিঠির জবাব আসবে অণ্ডালে। অণ্ডাল ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। পড়াশোনার কি হবে—সেও এক দারুণ দুশ্চিন্তা। মূর্খ হয়ে থাকতে হবে সারা জীবন!

শেষে একদিন দিদিমা'র কাছ থেকে পাঁচটি টাকা নিলাম। বললাম, কয়েকটা দিনের জন্যে আমি গা-ঢাকা দেবো। কিচ্ছু ভেবো না তুমি।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবি?

বললাম যেখানেই যাই তোমাকে চিঠি লিখে জানাব। আমি নিজেই জানি না কোথায় যাব।

মিথ্যে কথা বললাম। কোথায় যাব তা আমার অজানা নয়। আর এও জানি, যেখানে যাচ্ছি সেখানের নাম শুনলে দিদিমা দুঃখিত হবেন। তাঁর দুঃখিত হবার কারণটা অবশ্য অবহেলা করবার মত নয়। তবু নিরুপায় হয়ে আমি স্থির করলাম—সেইখানেই যাব।

যাব রূপসীপুর গ্রামে। বীরভূম জেলার পশ্চিম প্রান্তে সাঁওতাল পরগণার গায়ে-গায়ে লাগা ছোট্ট একখানি গ্রাম। রেল-ষ্টেশন থেকে বেশ কিছু দূর ঢেউ খেলানো মাঠের ওপর দিয়ে, পায়ে-হাঁটা আঁকা-বাঁকা পথ ধরে, ছোট ছোট শুকনো নদী আর শাল-মহুয়ার জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। ছেলেবেলায় দু'একবার গেছি সেখানে। স্বপ্নের মত মনে আছে তার স্মৃতি। মনে হয় যেন গরুর গাড়িতে চড়ে দূর অতীতের কোন্ এক বসন্ত-সন্ধ্যায় অতিক্রম করেছিলাম ওই সুদীর্ঘ পথ। জোড়া তালগাছের মাথায় দেখেছিলাম একফালি রূপোলী চাঁদ বনের গায়ে নেমেছিল কুয়াশার মত ধূসর জ্যোৎস্না, আর কেমন যেন একটা নেশা-ধরিয়ে-দেওয়া গন্ধ পেয়েছিলাম মহুয়া-ফুলের। দূরের কোন্ সাঁওতাল-পল্লী থেকে আসছিল মাদলের আওয়াজ আর শেয়াল ডাকছিল পথের ধারে।

শেয়ালের ডাক শুনে ভয়ে আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম বাবাকে। তিনিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

রূপসীপুর আমার পৈতৃক বাসস্থান।

অথচ আমার দিদিমা এই রূপসীপুরের নাম শুনলে চটে যান।

নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু আমাকে বলতে হবে না বললে আপনারা খেই হারিয়ে ফেলবেন।

আমার মা যখন মারা যান তখন আমি নিতান্ত শিশু। মাতৃহীন সেই শিশুকে আমার মাতামহী বুকে তুলে নিয়ে ছিলেন। তারপর পুত্রাধিক স্নেহে মানুষ করে তুলেছেন। তাই রূপসীপুরের নাম শুনলেই তাঁর ভয় হয়—আমার বাবা পাছে আমাকে নিয়ে চলে যায়, পাছে বাবার দিকে আমার টান হয়।

অবনীকে চুপি চুপি বলেছিলাম, আমার নামে চিঠিপত্র এলে রূপসীপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিস।

তোকে চিঠি কে লিখবে? নজরুল?

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু দিদিমাকে এখন রূপসীপুরের কথা বলিস না।

অবনীর ইচ্ছা নয়—আমি কোথাও যাই। বললে, ওখানে কি জন্যে যাবি মরতে? যাস না।

কিন্তু কিছুতেই যখন সে আমাকে বুঝিয়ে উঠতে পারলে না, তখন একসময় চুপি চুপি গিয়ে দিদিমাকে দিলে বলে। যা বারণ করেছিলাম তাই করলে।

দিদিমা ডেকে বললেন, লেখাপড়া তোর কিছু হবে না তা জানি। বাপ যার সাপ ধরে ধরে ঘুরে বেড়ায়, তার ছেলে কখনও মানুষ হয়? আবার শুনলাম নাকি সেইখানেই তুই যেতে চাচ্ছিস।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম, দিদিমা বলে যেতে লাগলেন, বাপ আবার বিয়ে করেছে, সৎ-মায়ের সংসার, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবি কি না তাই বা কে জানে। আর এখানে আছিস রাজার ছেলের মত। সেটা তোর সহ্য হচ্ছে না।

যে-বাপকে আমি সচরাচর দেখি না, যাকে আমি ক্বচিৎ কখনও দেখতে পাই—তার প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নেই বললে সত্য কথা বলা হয় না। কিন্তু সত্যি যে আমি বাবার কাছে যাবার জন্যই সেখানে যাচ্ছি তা নয়, আমি যাচ্ছি অন্য কারণে!

প্রথমত এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া দরকার। এবং পালিয়ে যাবার মত আর কোনও জায়গা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত আমার এই আকৈশোর পরিচিত কুঠি-কারখানার দেশ থেকে কয়েকটা দিনের জন্য যাব এমন একটা দেশ যেখানকার আকাশের দিকে তাকালে কল-কারখানার চিমনি দেখা যায় না, হেড্-গিয়ারের চাকা ঘোরে না, গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের ওপর মোটর ছোটে না। সেই যে কবে কখন দেখেছি—জোড়া তালগাছের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছিল, কুয়াশার মত জ্যোৎস্নার

প্লাবন নেমেছিল শালবনের পথের বাঁকে সেই কোন্ শেয়াল-ডাকা প্রান্তর থেকে শুনেছিলাম সাঁওতালদের মাদলের আওয়াজ, আর পেয়েছিলাম মহুয়াফুলের মিষ্টি মাতাল গন্ধ—যার কথা আমি আজও ভুলিনি। সব-কিছু মনে হয় যেন স্বপ্নে দেখা। সে স্বপ্ন যেন আবার একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু সে-কথা আমি দিদিমাকে বুঝাই কেমন করে? বুঝিয়ে বললেও তিনি কি বুঝবেন?

শেষে একদিন সত্যই চলে গেলাম।

চলে গেলাম সেই অচেনা পথ ধরে। স্টেশনে নেমেই দেখি কাঁকর-পাথরের শুকনো ডাঙা। একটা গাছ পর্যন্ত নেই। এ আমি কোথায় এলাম? কোথায় আমার সেই স্বপ্নলোক?

স্বপ্নভঙ্গের নিরাসা নিয়ে তবু চলেছি সেই শুষ্ক রুক্ষ নিষ্পাদপ প্রান্তরের ওপর পা ফেলে ফেলে। শুনেছি পশ্চিমদিকে গ্রাম। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে দিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে। কোনটা পূর্ব, কোন্‌টা পশ্চিম বুঝতে পারছি না। জনমানবহীন প্রান্তরে এমন কেউ নেই যাকে জিজ্ঞাসা করব।

ডাঙাটা পেরিয়েই দেখি, ঢেউ-খেলানো মাটি অকস্মাৎ নীচেয় নেমে গেছে। তারপর আবার উঠেছে আকাশের দিকে আর সেই নাবাল্ জমির ধার ঘেঁসে নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা দূরদূরান্তে গিয়ে মিশেছে। বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত পশ্চিমের আকাশে রক্তবর্ণ সূর্যকে দেখে আমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘুচে গেল। ঢালু জমিতে নেমে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চললাম। দু'দিকে স্নিগ্ধশ্যাম শস্যক্ষেত্র। তারই মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথের স্বচ্ছ নিশানা। সুমুখে শালের বন। বনের একপ্রান্তে কয়েকটি ছোট ছোট মাটির বাড়ি।

এতক্ষণ পরে মানুষের দেখা পেলাম। ক্ষেতের ধারে বসে বেড়া বাঁধছে একজন সাঁওতাল। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, রূপসীপুর কোনদিকে যাব?

উঠে দাঁড়ালো লোকটি। মাথায় বাবরি চুল। সুন্দর সুগঠিত দেহ। বললে, ইদিকে কুথা চলে এসেছিস তুঁই? উ গাঁ-টো তো হোই বাগে।

বলেই সে আঙুল বাড়িয়ে দূরের এক গ্রাম দেখিয়ে দিলে। তাকাতেই দেখি—সেই আমার আগেই দেখা জোড়া তালগাছ।

লোকটি বললে, বুনের ভিতরে একটো পথ আছে। হা ছ্যাখ্‌ ভাল্—হোই আম-বাগানের উদিকে তুদের গাঁ।

ধন্যবাদের কোনও প্রয়োজন নেই। কাকে ধন্যবাদ দেব? ধন্যবাদের মানেও বোঝে না এই অনার্য সাঁওতাল।

এগিয়ে গেলাম বনের দিকে। স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ। মহুয়ার গন্ধে মাতাল হাওয়া বইছে এলোমেলো। কিন্তু বনের ভেতর গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো। দু'দিকে দুটো পথ। কোনদিকে যাব।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। হঠাৎ শুনলাম চল্!

চমকে ফিরে তাকালাম!

ফিরে দেখি, সেই আদিবাসী অনার্য—সেই সাঁওতাল যুবক এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে। বললে, চল্ তুখে পথটো ধর‍াই দিয়ে আসি-গা।

একেই ধন্যবাদ না জানিয়ে চলে এসেছিলাম।

এখন তার মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি মাঝি?

আমার নাম জেনে তুর-কি হবেক? চল্।

নাম-না-জানা সেই মানুষটি দীর্ঘ বনপথ পার হ'য়ে আমাকে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে গেল।

তাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। সেই অসভ্য নিরক্ষর সাঁওতাল যুবককে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিতান্ত ছোট্ট একখানি গ্রামে।

রাজবাড়ির মত মস্ত বড় এক বাড়ি থেকে গিয়ে পড়লাম

বহুদিনের পুরনো একটি দালানবাড়ির দোতলার দু'খানি ঘরে। সাত ভাই-এর একান্নবর্তী পরিবার। বৃদ্ধ পিতামহ তখনও বেঁচে। দালানবাড়িতে সকলের সংকুলান হয় না, তাই আরও অনেকখানা জায়গা জুড়ে ছোট-বড় অনেকগুলো মাটির ঘর। ঘরের পর গোয়াল, গোয়ালের পর খামার, খামারের পর পুকুর।

মস্ত বড় চাষী গৃহস্থ। দেখলেই মনে হয়, এককালে অবস্থা খুব ভাল ছিল। এখন যেন একটু পড় পড়।

বুড়ো একা আর সামলাতে পারে না। ছেলেদের প্রত্যেকের একটি করে সংসার। অথচ বাপকে কেউ একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করে না।

সে এক অদ্ভুত সংসার।

অতি প্রত্যুষে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, বৃদ্ধ পিতামহ—ধপ ধপ করছে সাদা গায়ের রং—গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত। সবে মাত্র পুকুরে স্নান করে এসে বসেছেন বড়-বাড়ির উঠোনে একটি বেলগাছের তলায়। সুমুখে পূজা-আহ্নিকের নানাবিধ উপকরণ এনে নামিয়ে দিয়েছে যে-বৌ-এর যেদিন পালা।

আহ্নিকও তেমনি বিচিত্র।

একদিকে তামার পাত্রে ফুল বেলপাতা, কোষাকুষি, গঙ্গাজল, আর একদিকে একটি বোতলে কারণ-বারি, পানপাত্র, হুঁকো-কল্কে।

আহ্নিক শেষ হয়ে যাবার পর বার বার তামাক সেজে হাতে ধরিয়ে দেবার জন্য তাঁর একজন দৌহিত্র বসে আছে একটু দূরে।

বড় বড় ছেলেদের মধ্যে একজন দেখি প্রত্যহ সকালে কাঠের একটি টুল নিয়ে ঘরের দোরের কাছে বসে বসে 'বঙ্গবাসী' পড়ছেন। বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক কাগজের তিনি গ্রাহক। একখানি কাগজ তিনি সাতদিন ধরে পড়েন রোজ এক ঘণ্টা করে একদিন তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে সেকথা বললেন। আর বললেন, তিনি নাকি আমার কাকাবাবু হন। আমার যুদ্ধে যাবার খবরটা

তিনি অবশ্য শুনেছিলেন। আমার মুখ থেকে আর একবার শুনলেন। কিন্তু সংবাদটাকে তিনি যেন সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে বললেন, কি জানি বাবা, আমার 'বঙ্গবাসী'তে তো ওঠেনি।

আর-একজন দেখি ছোট একটি ঘরের ভেতর দিনরাত কাঠের কাজ করেছেন। কৌতূহলবশে একদিন সেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিলাম। ঢুকেই একেবারে অবাক। দেখি, ছোট-খাটো একটি কারখানা। নানারকমের যন্ত্রপাতি ইতস্তত ছড়ানো, আর গৃহস্বামী চোখে চশমা পরে একাগ্রমনে একটি কাঠের ওপর বাটালি দিয়ে কি যেন তৈরি করেছেন। স্পিরিটের একটা তীব্র গন্ধ নাকে এসে লাগছে!

নানা রকমের ছোটখাটো কাঠের আসবাবপত্র আর অসংখ্য খেলনা তিনি তৈরি করেছেন। ছোট্ট একটি বুককেস দেখালম সদ্য তৈরী হয়েছে। অপরাধের মধ্যে হাত দিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম জিনিসটা। চট্ করে পিঠের ওপর এক বাড়ি পড়তেই পিছন ফিরে দেখি, হাতের হাতুড়িটা ফেলে দিয়ে একটা কাঠ তুলে নিয়েছেন তিনি। বলছেন, দিলি তো বার্নিশ চটিয়ে। বেরো, বেরো এখান থেকে। এখুনি বেরো।

বলেই তিনি বোধ করি চিনতে পারলেন। নাকের চশমাটা একটু তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুই? ধরণীর ছেলে?

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

—তা বলতে হয়। আমি ভাবলাম বুঝি আন্নাকালীর ব্যাটা! বলেই তিনি হি হি করে হাসলেন। বললেন, এই ছ্যাখ্ এসব আমি তৈরি করেছি। নিজের হাতে।

বললাম, তা এ-সব আপনি শহরে বিক্রি করেন না কেন?

মুখখানা তাঁর গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। কোনও জবাব না দিয়ে আবার হাতুড়ি বাটালি তুলে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। করতে করতে

আপনমনেই বলতে লাগলেন, ইচ্ছে ছিল একটা কিছু করবার, কিন্তু টাকা কোথায় ?

বলেই তিনি তাড়াতাড়ি চেপে গেলেন কথাটা। মুখ তুলে বললেন, আমি তোমার কে হই জান তো? জ্যেঠামশাই। ন' জ্যেঠাবাবু। আমি করি এই কাঠের কাজ, আর তোমার বাবা মাটির কাজ করতে পারে খুব ভাল। বড় দাদা ছিল ডাক্তার, মেজদাদা আদালতে পেস্কার আর বাকি সব আমরা হ'য়েছি এক-একটি ওস্তাদ। হরিদাস খুব সুন্দর তবলা বাজায়, আর আনন্দ বাজায় বেহালা।

ঠুক্ ঠুক্ করে কাজ করেন আর বলে চলেন তাঁদের বংশের ইতিহাস।

সে ইতিহাস অবশ্য আমারও।

আমারও রক্তের মধ্যে তার সন্ধান যে পাই না তা নয়। তবে এখানে এসে যেন সেটা আরও বেশি মাত্রায় অনুভব করছি।

বাড়ির দোতলায় মাত্র দু'খানি ঘর। বাকিটা সব খোলা ছাত। মনে হয় যেন বাড়িটা তৈরি হতে হতে অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ছাতের ওপর খাড়া কয়েকটা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ছাত আঁটা হয়নি।

সবটা আমার বাবার দখলে।

পাকা ইটের সেই দেয়ালগুলোর ওপর কাঠ আর খড় দিয়ে ছাদন করিয়ে নিয়ে সে এক অদ্ভুত রকমের ঘর তৈরি করে নিয়েছেন তিনি।

লম্বা লম্বা সেই ঘরগুলো হয়েছে তাঁর বিচিত্র কর্মশালা।

দশ.

এ'টা ঘরে দেখছি নানারকমের মাটির তৈরী জীব জন্তু! চট্ করে দেখলে চমকে উঠতে হয়। মনে হয়—জীবন্ত।

ছোট্ট একটি ভেড়ার ছানাকে ধরবার জন্যে একটা শেয়াল পা টিপে টিপে এগুচ্ছে। পেছনে তিনটে তিন রকমের কুকুর ছুটছে তাকে ধরবার জন্যে।

ঘরের এক কোণে একটি ছাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার চারটি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

ওদিকে একটি ছেলে আপন মনে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

দেয়ালের গায়ে একটি টিক্‌টিকি ছুটেছে একটা বিছে ধরবার জন্যে।

এটা হল নির্জীব মাটির পুতুলের ঘর।

তার পাশের ঘরে সব জীবন্ত জীবের সমারোহ। দেয়ালজোড়া পাতলা জাল-দেওয়া কাঠের র‍্যাক। আর সেই পাঁচতলা র‍্যাকের ভেতর প্রায় শ'খানেক গিনিপিগ্ ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক র‍্যাকের ওপর তিনটে বড় বড় সাপের ঝাঁপি।

মুখপোড়া একটি বাঁদর খেলা করছে ঘরের ভেতর। তার গলায় একটি ঘুঙুর বাঁধা।

বাঁদরটিকে বেঁধে রাখা হয়নি। সম্পূর্ণ স্বাধীন সে। ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তবু সে পালায় না। বিচিত্র!

সবচেয়ে বিচিত্র দেখলাম একটি বক।

পরের দিন দুপুরে দেখলাম আমার বিমাতা বাড়ির খোলা ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকছেন, টুল্ টুল্! টুল্ টুল্।

প্রথমটা কাকে ডাকছেন বুঝতে পারিনি। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। শুধু দেখলাম, সাদা একটি বক কোত্থেকে উড়ে এসে বসল ভাঙা ছাতের আলসের ওপর। মা বললেন, এসো, আমাকে কৃতার্থ করবে এসো। খেতে দিইনি শুনলে তোমার বাবু এসে আপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়বেন।

বকটি দেখলাম, লম্বা লম্বা পা ফেলে মার পায়ের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। মা হাতে করে একমুঠো ভাত এনেছিলেন তার জন্যে। সেগুলি তিনি ছড়িয়ে দিলেন। বকটি নাচতে নাচতে সেই ভাত খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল। ভারি মজা লাগল দেখতে। বকের নাম টুল্‌টুল্। বকের নাকে একটি নোলক। দু-পায়ে দুটি ছোট ছোট রিং।

খাওয়া শেষ হতেই টুল্‌টুল্ উড়ে চলে গেল।

মা'র নজর পড়ল আমার দিকে। বললে, কি দেখছিস? এই সব তোর বাপের কীর্ত্তি। দেখে যা।

বাবার সঙ্গে তখনও আমার দেখা হয়নি। জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা কখন আসবেন?

মা বললেন, কি জানি বাবা, যিনি আসবেন তিনিই জানেন।

এই বলে তিনি ইতিহাস বিবৃত করতে আরম্ভ করলেন।—সেদিন তখন খেতে বসেছিল তোর বাবা, খবর এল লোকপুরের একটি ছেলেকে গোখ্‌রো সাপে কামড়েছে। ব্যস্, যেমন বসেছিল তেমনি উঠল, খাওয়া আর হলো না। কি-সব জড়িবড়ি পকেটে নিয়ে তখনই ছুটল সেই লোকটার সঙ্গে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর জন্যে বাবাকে ওরা টাকা দেবে?

মা বললেন, দিলেও নেবে না তোর বাবা। বলে, এর জন্যে নাকি টাকা নিতে নেই।

—ছেলেটা যদি বেঁচে যায়, তবু নেবে না?

—মরে আবার কখন? সবাই তো বাঁচে।

বলতে বলতেই বাবা এলেন।

একটা ছেলে এসে খবর দিলে।—'ফুলবাবু এলো।'

দেখছি আমার বাবাকে এখানে সবাই ফুলবাবু বলে। তিনি তাঁর বাবার চতুর্থ সন্তান।

খবরটা পেয়ে মা আমাকে বললেন, দেখবি আয়।

খোলা ছাতের দক্ষিণদিকের আল্‌সের কাছে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। নীচে তাকিয়ে দেখলাম, একটা গরুরগাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে বাবা নামলেন সেই গাড়ী থেকে। দুটো ঝুড়িভর্তি নানারকমের তরিতরকারি আনাজ নামানো হ'ল। ছোট একটি চুপড়িতে অনেকগুলি হাঁসের ডিম। আর সবার শেষে দড়ি দিয়ে বাঁধা সরা-ঢাকা একটি মাটির হাঁড়ি।

হাঁড়িটা গাড়োয়ান কিছুতেই হাত দিয়ে ছুঁল না। বাবা নিজেই সেটা নামিয়ে রাখলেন পথের পাশে।

মা বললেন, হয়েছে!

তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

মা বললেন, সেই সাপটাকে ধরে এনেছে বাড়ীতে।

—কোথায়?

বললেন, ওই যে মেটে হাঁড়ির ভেতর।

এই বলে তিনি সেইখান থেকেই বোধ করি বাবাকে উদ্দেশ করে বললেন, ও-হাঁড়ি আর ওপরে তুলো না। যেখানে হোক রেখে এসো।

বাবা জবাব দিলেন, অতি উৎকৃষ্ট কালীয় নাগ। দেখবে না? বড় ভাল জাতের সাপ।

মা বললেন, তুমি দেখেছ তো? তাহলেই হবে।

সাপের হাঁড়িটা নীচে কোথায় যেন দিয়ে বাবা ওপরে এলেন। বললেন, সাপটা আমি নিয়ে এসেছি ইয়াসিন ওস্তাদের জন্যে। ওর বিবি বলেছিল, সাপ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বাবু, যদি একটা সাপ-টাপ পাও তো ওকে দিও।

মা বললেন, ইয়াসিনের তো সাপ আছে।

বাবা বললেন, দুটো সাপ ছিল। দুটোই মরে গেছে।

—কি বিপদ যে কোন্‌দিন হবে কে জানে! সাপ-টাপগুলো আর ধরো না। চা খাবে এসো।

এই বলে ষ্টোভ জেলে মা চা করতে বসলেন, আর বাবা শুরু করলেন সাপটাকে কেমন করে ধরলেন, তার ইতিবৃত্ত।

বললেন, যে-ছেলেটাকে কামড়েছিল, আমি যখন গেলাম, তার আর কিছু ছিল না। অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি তাকে। তাই তো এত দেরি হলো।

আর ঠিক সেই সময় ওদিকে আবার আর-এক বিপদ! হৈ হৈ করে একদল ছেলে ছুটে এলো—হাতে লাঠি, সাবল, বর্শা।

এসেই বললে, আপনি একবার আসুন চট্ করে।

সাপটাকে তারা নাকি খোঁচা মেরে মেরে আর ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তেঁতুল গাছের ডাল থেকে নামিয়েছে। কিন্তু কেলে গোখ্‌রো সাপটা এত বড় আর এত তেজী যে, কেউ তার কাছে যেতে পারছে না। দূরে থেকে যতবার তাকে মারবার চেষ্টা করা হয়েছে, ততবারই সাপটা ফণা তুলে রুখে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আর কেউ তাব ধারে কাছে যায়নি। অত অত লোক দেখে সাপটাও তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়েছে রমণ মোড়লের খামারে। খামারের একদিকে গরুর গোয়াল, আর একদিকে দুটো বড় বড় খড়ের গাদা। কোথায় যে সে ঢুকেছে কেউ কিছু ঠিক করতে পারছে না। রমণ মোড়ল সবাইকে গালাগালি করছে। বলছে, মারতেই যদি না পারবি তো ওকে নামাতে গেলি কেন গাছ থেকে?

কাঁদ-কাঁদ হয়ে একটা লোক আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে এলো। শুনলাম সে রমণ মোড়লের ছোট ভাই। বললে, আমাকেই ওই সাক্ষাৎ যমের সামনে যেতে হবে হুজুর। গরু বাঁধতে হবে। গাই দুইতে হবে। খড়ের গাদা থেকে খড় টেনে বার করতে হবে। এখন আপনি না বাঁচালে আমি তো গেলাম।

অনেক করে বোঝালাম তাদের। বললাম, মানুষের ভয়ে ওরা ওমনি করে লুকিয়ে বেড়ায়। তার ওপর আজ ও দেখেছে এতগুলো মানুষ ওকে তাড়া করেছে। প্রাণের ভয়ে এখন যেখানে গিয়ে লুকিয়েছে, সেখান থেকে ও সহজে বার হবে না। তোমার কোনও ভয় নেই। যাও।

লোকটার বোধ হয় বিশ্বাস হলো না। বললে, ওই তো রুগী আপনার উঠে বসেছে। আপনি চলুন হুজুর। সাপটাকে আপনি শুধু বের করে দেবেন। আপনি কড়ি চালতে জানেন। আমরা সব শুনেছি।

মনে মনে হাসলাম। কড়ি চেলে জীবনে সাপ বের করেছি অনেক। কিন্তু কড়ি চালা-টালা সব বাজে কথা। মন্ত্র-তন্ত্র, কড়ি চালা, হাত চালা— সব কিছু লোকজনের বিশ্বাসের জন্যে। তবু বললাম, সবই জানি মোড়ল, কিন্তু ও সাপ আজ যদি কাউকে কামড়ায় তো আমি তার জীবনের জন্যে দায়ী রইলাম। সাপ আর বাঘ কখনও এক জায়গায় থাকে না। তাড়া-খাওয়া সাপ তো থাকবেই না। এতক্ষণ ছ্যাখোগে হয়ত তোমাদের খামার থেকেও সে উধাও হয়েছে।

মোড়ল বললে, আজ্ঞে না, পালাতে পারবে না। খামারের আশে পাশে আমরা লোক রেখে এসেছি

এই কথা বলতে না বলতেই একটা ছেলে ছুটে এসে খবর দিলে সাপটা বেরিয়েছিল, আমাদের দেখে আবার গর্তে ঢুকে পড়লো। কোথায় ঢুকেছে আমরা দেখেছি।

ছেলেরা শুনলে না কিছুতেই। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলে। তাদের প্রথমে একটা হাঁড়ি আনতে বললাম,। আর হাঁড়ির মুখে ঢাকা দেবার জন্যে একটা সরা। বললাম, কেউ তোমরা মারতে পারবে না ওকে। সাপটাকে আমি জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাব।

ইয়াসিনের কথা তখন আমার মনে পড়েছে।

তারা যে জায়গাটা দেখিয়েছিল, আমি জানি সাপ. সেখানে

নেই। কান পেতে শুনতেই তার নিশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল ঠিক তার উল্টো দিকে। পুরনো একটা খড়ের গাদার পাশে অনেক দিন থেকে কতকগুলো খোয়া ইট জড়ো করা ছিল। সাপটা গিয়ে ঢুকেছিল তারই তলায়। ছেলেদের বললাম, তোমরা আস্তে আস্তে এই দিকের ইটগুলো সরাও।

মস্ত এক লাঠি হাতে নিয়ে একজন জোয়ান ছোকরা ইট সরাবার জন্যে এগিয়ে এলো। কিন্তু ইটে হাত দিতে গিয়ে সাপটার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ যেই তার কানে গেছে, অমনি সে সেখান থেকে ছুটে একেবারে দশ হাত দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাপ্‌স্‌! যে রকম গর্জন করছে, এক্ষুনি ও তেড়ে এসে কামড়ায় বুঝি। আমি পারবো না ইট সরাতে।

ছেলেদের অনেক কষ্টে বোঝালাম, ওটা ওর রাগের গর্জন নয়, ওটা ওর ভয়ের দীর্ঘনিশ্বাস। খুব যখন ভয় পায়, তখন ওরা ওইরকম করে। আমি রয়েছি, তোমাদের এতটুকু ভয় নেই। আমি ওকে ধরে ফেলব।

হাতে আমার ছোট্ট একটা কাঠের টুকরো এ ছাড়া আর কিছু নেই। ওরা বোধ হয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না।

আমি চাই ইটগুলো এমনভাবে সরিয়ে ফেলতে যেখানে সাপটা একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে যাবে। না পারবে মুখটাকে কোথাও গুঁজে রাখতে, না পারবে লেজ দিয়ে কোনও কিছু জড়িয়ে ধরতে।

ছেলেরা কেউ এগিয়ে এলো না লাঠি-সোঁটা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করতে লাগল।

মা এই সময় আমাদের সামনে দু'কাপ চা নামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, সাপ ধরার গল্প আর শুনিসনি বাবা! ও-সব শুনলে আমার গা ঘিন ঘিন করে।

বাবা বললেন, তোমাকে তো শোনাইনি।

মা বললেন, শুনতে আমি চাই না। কিন্তু ওকেই-বা শোনাচ্ছ কেন? ওকেও কি নিজের পাটে বসাতে চাও?

—না না, সব কিছু জেনে রাখা ভাল।

মা বললেন ওই বিদ্যেগুলো ওর না জানলেও চলবে।

এই বলে তিনি চলে গেলেন সেখান থেকে ।

আমি কিন্তু তখন শোনবার জন্যে অস্থির হযে উঠেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর ?

চা খেতে খেতে বাবা বলতে লাগলেন, আমাকেই সরাতে হলো ইটগুলো। একটি একটি করে সরাতে সময লাগল অনেক। মাটির হাঁড়িটা হাতের কাছে এনে রাখলাম। ছেলেদের সাবধান করে দিলাম —কেউ যেন ঢিলটিল না ছোঁড়ে। নিজের বসবার দাঁড়াবার সুবিধে করবার জন্যে একদিকের অনেকগুলো ইট সরিয়ে ফেললাম। সাপটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম সেখানকার খান-দুই ইট সরাবো শেষে। কিন্তু সাপটাকে দেখতে পেয়েই বোধ কবি একটি ছেলে চীৎকার করে উঠল—সরে যান। মুখ বাড়িয়েছে।

কালীয় নাগ খুব তেজী সাপ। ছেলেটা যেই চীৎকার করেছে, সাপটাও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে ইটের ফাঁকে এত বড় ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই মারলে এক ছোবল। ছোবলটা ফট্ করে লাগলো গিয়ে একটা ইটের ওপর। ভালই হলো। ইট দুটো আগে সরিয়ে ফেললে সাপটা খেলবার জায়গা পেতো। আমি আর এক সেকেণ্ডও দেরি না করে ধবে ফেললাম সাপটাকে। ধরবার ভারি একটা মজার কায়দা আছে। ডান হাত দিয়ে মুখখানা চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে লেজটা ধরতে হয় বাঁ-হাত দিযে নইলে লেজটা যদি একবার সে হাতে জড়াতে পারে তো ব্যস্, আর রক্ষা নেই। এমন জোরে চাপ দেবে যে, যত বড় জোয়ানই হোক, হাতের মুঠো তার আলগা হয়ে যাবেই। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারবে। বিষ-দাঁত দুটো বসিয়ে দিতে যতটুকু দেরী।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি করলেন ?

—লেজে ধরে তুলে ওদের মাথাটা নীচের দিকে করে বারকতক সজোরে ঝাকানি দিলেই ওদের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে যায়, সহজে আর

মাথা তুলতে পারে না। সেইরকম করেই ওকে হাঁড়িতে পুরে নিয়ে এসেছি। কাল ইয়াসিনকে দিয়ে আসব। বিষ-দাঁত ভেঙে ও খেলা দেখাবে।

পরের দিন সকালে বাবা নিজেই যাচ্ছিলেন ইয়াসিনের বাড়ি। আমি বললাম, আমি যাব। সাপটাকে দেখবো।

বাবা বললেন, চল।

মা এসে দাঁড়ালেন আমাদের কাছে। বললেন, লেখাপড়া কি তুই ছেড়ে দিয়ে এসেছিস ?

বললাম, না তো।

মা বললেন, কতদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছিস, ভেবেছিলাম দু'চারদিন থাকতে বলব, কিন্তু যে-রকম দেখছি তাতে তোর চলে যাওয়াই মঙ্গল।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

মা বললেন, বুঝতে পারছো না ? বাপ-ব্যাটায় চললে সাপের হাঁড়ি নিয়ে ইয়াসিন-সাপুড়ের বাড়ি। লোকে দেখলে বলবে কি ? আর এই কথা যদি রায়-সাহেবের কানে গিয়ে ওঠে !

—উঠুকগে। আয় !

বাবা জুতো পায়ে দিলেন। আমিও মহা উৎসাহে চললাম তাঁর পিছু পিছু।

সাপের হাঁড়িটা হাতে করে নিয়ে যেতে রাজী হলো না কেউ। এক টুকরো দড়ি দিয়ে হাঁড়ির মুখটা বেঁধে বাবা নিজেই সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিলেন। বললেন, বেশিদূর নয়। চল। শিগ্‌গীর ফিরে আসব।

পায়ে-চলা মেঠো পথ ধরে মস্ত বড় একটা পুকুরের পাড়ে গিয়ে উঠলাম। ঘাটের কাছে বেশ খানিকটা জায়গায় পরিষ্কার জল। বাকিটা সব ঢলা ঢলা পদ্মপাতা আর পদ্মফুলে ভরা। ওদিকে পাড়ের ওপর সারি সারি তালের গাছ। পদ্মপাতার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা

পানকৌড়ি সাঁতার কাটছে, আর কয়েকটা শুধু ডুবছে আর উঠছে। যেন কত ভয় ওদের। বেশ লাগছিল দেখতে। দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

বাবার ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, তিনি তখন অনেক দূরে চলে গেছেন।

ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি সম্মুখে ছোট্ট একটি নদী। নদী না বলে খাল বলাই ভাল। বালির ওপর দিয়ে কাঁচের মত স্বচ্ছ জলের ধারা ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে। ওপরে কয়েকটা বড় বড় গাছ তাদের দীঘ ছায়া ফেলেছে সেই জলের ওপর।

এপারে গাছ নেই, সারি সারি শুধু ফসলের ক্ষেত। আর সেই ক্ষেতের পাশ দিয়ে আমরা চলেছি আঁকা-বাঁকা পথে ধরে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, খালের একটা দিকে প্রচুর জল জমা হয়ে আছে, আর কয়েকজন চাষী সেই জল তুলে নালা কেটে ক্ষেতে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেখেই একজন বললে, পেন্নাম গো মুখুজ্যেমশাই। কোথায় ধরলেন ওটা ?

সহাস্যে বাবা বললেন, লোকপুরে।

কে একজন বলে উঠল, এখানে ছেড়ে দেবেন না যেন।

—না। এটা ইয়াসিনকে দিতে যাচ্ছি।

সামনেই ইয়াসিনদের গ্রাম। পরিচ্ছন্ন একটি আম-বাগানের ভেতর খান-পঁচিশেক মাটির ঘর। খালের একেবারে ধার ঘেঁষে ইয়াসিনের ছোট্ট বাড়ি।

উঠোনে একটি নিমগাছের তলায় ছোট ছোট মুরগীর বাচ্চাগুলিকে বাঁশের একটি চুপড়ি চাপা দিচ্ছিল ইয়াসিন। বাবাকে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, সেলাম।

হাঁড়িটা বাবার হাত থেকে নিয়ে বললে, খবর পেলে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসতাম বাবু, আপনি কেন এত কষ্ট করে এলেন ?

ঘরের কোণে একটা ন্যাড়া প্রাচীরের কোলে একটুখানি ছায়া পড়েছিল, সেইখানে গিয়ে হাঁড়িটা ইয়াসিন নামিয়ে রাখলে।

—সেলাম গো বাবুজী !

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, ভিজে কাপড়ে থমকে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। কাঁখের কলসীতে এক কলসী জল। খাল থেকে সন্ত স্নান করে উঠে এসেছে বলেই মনে হলো। পিঠে একপিঠ ভিজে চুল, ফরসা গায়ের রং। আঁটসাঁট গড়ন।

ইয়াসিনের বৌ বোধহয়।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ওষুধটা খেয়েছিলে? কেমন আছ এখন?

টানা টানা চোখ দুটি তুলে মেয়েটি এক গাল হেসে বললে, খুব ভাল আছি। আপনার ওষুধ খেয়ে আমার সব ভাল হয়ে গেছে। কেন, মিঞা-সাহেব আপনাকে কিছু বলে নাই?

বাবা বললেন, না, বলেনি।

মেয়েটি বললে, কি গো তুমি যে সাপ নিয়ে একেবারে মশগুল হয়ে গেলে? মোড়া দুটো বের করে দাও। ওরা দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

—এই ছাখো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ দিই বার করে।

বলেই ইয়াসিন ঘরের ভেতর থেকে বাঁশের দুটি মোড়া বের করে এনে নিমগাছের ছায়ায় পেতে দিয়ে বললে, বসুন।

ইয়াসিনের বিবি ঘরের দিকে যেতে যেতে ফিরে তাকালো একবার। থমকে দাঁড়িয়ে মনে হলো কি যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও আর করলে না। ডাকলে, কই, শোনো।

বলেই সে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাবার সুমুখে মাটিতে উবু হয়ে বসলো ইয়াসিন। জিজ্ঞাসা করলে, সাপটাকে তো এখনও কামানো হয়নি?

বাবা বললেন, না। বিষদাঁত ভাঙবার সময় পাইনি। খুব ভাল জাতের কালীয় নাগ। অনেকদিন তুমি খেলা দেখাতে পারবে ওকে নিয়ে।

ইয়াসিন বললে, বিষদাঁত আমি এক্ষুনি ভেঙে দিচ্ছি। এলেন যখন এত কষ্ট করে আর-একটু বসুন গুরুজী।

বাবা বললেন, তোমার বিবি কি জন্যে ডাকছে তোমাকে। যাও শুনে এসো।

ইয়াসিন বললে, যাই। ভিজে কাপড়টা ছাড়ুক।

এই বলে সে উঠে গেল।

বিবিসাহেবা কি বললে শোনা গেল না, কিন্তু ইয়াসিন বললে, গাঁয়েরই কেউ হবে। ওঁর তো শিষ্য সাকরেদের অভাব নাই।

বলেই সে আমাদের কাছে এসে বললে, শুধোচ্ছে—আপনার সঙ্গের উটি কে?

বাবা বললেন, আমার ছেলে।

—অ্যাঁ।

ইয়াসিন দারুণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর তার বৌ ঘরের ভেতর থেকেই বলে উঠল, ওমা! তাই নাকি?

বিবিসাহেবা বেরিয়ে এলো।

—ছাখো দেখি, আজ আমার কত ভাগ্যি! এসো এসো তুমি এইখানে এসো।

বললাম, এই তো বেশ আছি। নিমগাছের তলায় সুন্দর হাওয়া বইছে। বেশ শীতল ছায়া।

হাওয়া এখানেও বইবে তুমি এসো। বলে সে আমার কাছে এসে বললে, ওঠো।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। যে মোড়াটায় বসেছিলাম সেই মোড়াটা সে তুলে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে যেতে হলো তার সঙ্গে। বললে, ওরা এখন সাপটার বিষদাঁত ভাঙবে। ও-সব দেখতে নেই। খুব খারাপ লাগবে।

বললাম, সাপটাকে আমি দেখবো যে।

ঘরের সুমুখে পরিচ্ছন্ন ঢাকা-দেওয়া বারান্দার ওপর মোড়াটি পেতে

দিয়ে বললে, বেশ তো, কামানো হয়ে যাক, দেখবে। কথা কইবার লোক পাই না, বোসো—দুটো কথা কই। আমি একটু চ তৈরি করি, মুরগীর ডিম খাও তো ?

সর্বনাশ ! এ বলে কি ?

বললাম, না না—ও-সব কেন ? ও সব করতে হবে না।

—আমার হাতে খাবে না বুঝি ?

মেয়েটি তার সেই আয়ত দুটি কালো চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে। টানা টানা দুটি ভুরুর মাঝখানে কাঁচপোকার একটি টিপ যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে।

আমি বোধকরি বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। মেয়েটি বুঝতে পারলে। বললে, ভয় নেই, বাবাটি তোমার মহাদেব, নীলকণ্ঠ। ওঁর জাত-বিচের নাই।

বলেই সে জোরে জোরে, আমার বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, ও মুখুজ্যেবাবু, শুনছেন ? আপনার ছেলে যে চা খেতে চাচ্ছে না।

ওরা তখন সাপের হাঁড়িটা গাছের তলায় নিয়ে গেছে। ইয়াসিন একটা ন্যাকড়ায় জড়ানো কি-সব যন্ত্রপাতি বের করছে।

বাবা বললেন, ইচ্ছে হয় তো খা। নয় তো খাস্‌নি।

চালার একদিকে দড়ির একটি শিকে ঝুলছিল। সেই শিকেয়-টাঙানো চুপড়ি থেকে কয়েকটি মুরগীর ডিম বের করলে বিবিসাহেবা। বললে, কি ? ইচ্ছে হবে তো ?

বললাম, হবে।

কয়লার উনোনটা গন্ গন্ করে জ্বলছিল।

সেই উনোনের কাছে এসে বসল সে। পরনে একরঙা একটি শাড়ি—কোমরে বেশ আঁট করে জড়ানো। পিঠের দীর্ঘ চুল মাটিতে লুটোচ্ছে। চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েই সে ডিমগুলি পরিষ্কার করে ধুতে লাগল। কাজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে ? তোমার আর ভাই-বোন আছে ?

বললাম, না। আমি একা।

—তোমার নাম কি ?

বললাম, আমার দুটো নাম। এখানে সবাই আমাকে শ্যামল বলে ডাকে।

মেয়েটি ফিক্ করে হাসলে। হাসলে আরও সুন্দর দেখায় তাকে। মুক্তোর মত দাঁতের সারি। তার ওপর গালে সুন্দর দুটি টোল পড়ে। ইয়াসিনের চেয়ে বয়স ওর অনেক কম।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসলে যে ?

মেয়েটি মাথা নীচু করে বললে, আমারও দুটো নাম। একটা নাম শিবানী, একটা নাম নুরজাহান।

শিবানী ? তার মানে ? মুসলমান মেয়ের নাম তো শিবানী হয় না।

মেয়েটি মুখ তুললে। চাপা হাসি তা' মুখে যেন লেগে রয়েছে। বললে, কে বললে আমি মুসলমান ? আমি হিন্দুর মেয়ে।

মেয়েটিকে দেখেই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল। বললাম, ইয়াসিন মিঞা তাহলে তোমাকে বিয়ে করেনি ?

মেয়েটি ঘাড় আন্দোলিত করে বললে, হ্যাঁ। বিয়ে করেছে। বিয়ে না করলে আমি আসি কখনও ?

—হিন্দুর মেয়ে হয়ে মুসলমানকে বিয়ে করলে ? কেন করলে ?

মুখ নামিয়ে কাজ করতে করতে মেয়েটি আবার মুখ তুলে হাসলে। বললে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ। কেন বিয়ে করে জানো না ? থাক্, তোমাকে ওসব আর শুনতে হবে না। তুমি তোমার কথা বল। আমি শুনি। সৎ-মা কেমন ? তোমাকে ভালবাসে ?

আমি কিন্তু কিছুতেই তাকে ছাড়লাম না। বললাম, বল তুমি কেন বিয়ে করলে। তোমাকে বলতেই হবে।

—যদি না বলি ?

—আমি মুখে দেব না কিছু। চললাম। বলেই ওঠবার ভান করলাম একটুখানি।

শিবানী বললে, বোসো বোসো, রাগ করো না। বলছি।

বলেছিল সে তার জীবনের ইতিহাস। বলবার আগে সে কিন্তু আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, তার আগে বল তুমি আমকে ঘেন্না করবে না।

বলেছিলাম, না, ঘৃণা করব না। বল।

—বল তুমি এখানে আসবে মাঝে-মাঝে।

বলেছিলাম, যদি এখানে থাকি তো আসব। নিশ্চয় আসবো।

—ও মা, তুমি এখানে থাকো না বুঝি?

—না। আমি থাকি আমার মামার-বাড়িতে।

তবু সে বলেছিল। বলেছিল, সে নাচতে জানে, গাইতে জানে। এই নাচ-গানের জন্যেই তার ঘর ছাড়া। মুর্শিদাবাদের একটা গ্রামে তার বাড়ি। ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে গিয়েছিল। বুড়ী পিসিমা তাকে মানুষ করেছে। তার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, ছিল না শুধু তাকে ধরে রাখবার মানুষ। তাই সে কম বয়সেই পালিয়েছিল ঘর ছেড়ে। কত দেশ কত জায়গা সে ঘুরেছে, কোথাও বেশিদিন টিকতে পারেনি। শেষে অনেক ঘাটের জল খেয়ে পান্না দাসীর ঝুমুরের দলে চাকরি পেয়ে ছিল। সেরা গাইয়ে সেরা নাচিয়ে বলে তখন তার খুব নাম। পান্না দাসী নিজের মেয়ের মতন ভালবাসতো তাকে। বেশ শান্তিতে ছিল তার কাছে। কিন্তু শান্তিতে ভগবান তাকে থাকতে দিলে না। একদিন অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিলে ওই মিনসে ইয়াসিন। ইয়াসিনের তখন ছোকরা বয়েস। মাথায় বাবরি চুল, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, পেশী ফোলা হাত দুটো লোহার মত শক্ত। ঝুমুরের দল এখান-ওখান ঘুরতে ঘুরতে বীরভূম জেলার ছোট একটি শহরের মতন জায়গায় বাসা বেঁধেছে। রাত্তিরে কাজ করে দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছিল সে দলের আরও তিনটে মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সাপ-খেলানো বাঁশীর আওয়াজ শুনে। সবাই ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। শিবানীও বাদ গেল না। দেখলে সাপের দুটো ঝাঁপি সামনে নামিয়ে রেখে ঝাঁড়ির

উঠোনে ছোট একটা পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন তুব্‌ড়ি বাঁশী বাজাচ্ছে। মেয়েদের দেখে বাঁশী থামিয়ে বললে, সাপের খেলা দেখাবে?

শিবানী এগিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, কি নেবে?

বলে যেই সে তার চোখের দিকে তাকিয়েছে, মাথাটি তার ঘুরে গেল। ইয়াসিনও তাকিয়ে রইল তার দিকে। বললে, যা দেবে।

শিবানীর মনে হলো লোকটা যেন তার কতকালের চেনা।

সাপের খেলা দেখানো শুরু হলো।

কিন্তু কে দেখবে তখন সাপের খেলা? শিবানী তাকিয়ে আছে ইয়াসিনের দিকে। ইয়াসিনও ঘন ঘন তাকাচ্ছে শিবানীর দিকে।

সেই সুযোগে একটা সাপ পালিয়ে যাচ্ছিল ঝাপি থেকে বেরিয়ে।

মেয়েগুলো চেঁচিয়ে লাফিয়ে জাপ্‌টা-জাপটি করে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুললে সাপের ভয়ে। ইয়াসিন চকিতে সাপটাকে ধরে ফেললে। সাপটাকে হাতে নিয়েই সে এগিয়ে এলে শিবানীর কাছে। শিবানী তখন বাঁহাত দিয়ে চালার একটি খুঁটি জড়িয়ে ধরেছে। বললে, সাপটাকে রেখে এসো আগে।

ইয়াসিন হাসতে হাসতে সাপটাকে ঝাঁপিতে ঢোকালে। শিবানীর আঁচলের খুঁটে বাঁধা ছিল একটা রূপোর টাকা। সেইটে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ইয়াসিনের গায়ে। বললে এদিকে আর এসো না।

বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো গিয়ে তার বিছানায়।

সেদিন রাত্রে ঝুমুরের আসরে গান যখন খুব জমে উঠেছে, শিবানী হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, আসরের একপাশে বসে আছে ইয়াসিন। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে অসভ্যের মত। ইয়াসিনের গায়ে জামা,

পরনে ফরসা ধুতি আর তখন সাপুড়ে বলে মনেই হয়না। যেন কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে।

প্যালা পড়ছে চারিদিক থেকে। ইয়াসিন তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলে একটা টাকা।

মনে হলো সে যেন তারই-দেওয়া সেই রূপোর টাকাটি ফেরত দিলে। তারপর ক্রমাগত সে ছুঁড়তে লাগল টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি। কত যে দিলে কে জানে। এত পয়সা সে পেলে কোথায়?

তিন রাত্রি ঝুমুরের আসর বসল। আর এই তিনটি রাতের স্মৃতি অক্ষয় হ'য়ে থাকল শিবানীর জীবনে।

প্রতিটি রাত্রেই ইয়াসিনকে দেখা গেল ঠিক এক জায়গায় বসে। প্যালাও দিলে সেইরকম করে।

কিন্তু দিনের বেলা একদিনও সে সাপ খেলাতে এলো না।

তার পরের দিন বিশ্রাম। ক্লান্ত হয়ে সারাদিন পড়ে ঘুমোলো শিবানী। রাত্রে কাজকর্ম বিশেষ কিছু নেই। পরের দিন সকালেই সেখানকার ডেরা তুলে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। পান্না দাসী সন্ধ্যে থেকে তার মদের পাঁট নিয়ে বসল। কাজ যেদিন না থাকে, সেদিন সে প্রাণভরে মদ খায়, তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। মেয়েরা কেউ ও-সব খায় না। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। দলে শিবানীর খাতির একটু বেশি। আলাদা ঘরে তার বিছানা। একজন দাসী আছে তার সেবা করবার জন্যে। কাজ যেদিন না থাকে, তার গা-হাত-পা টিপে দেয়। সেদিন কিন্তু দাসী আর এলো না। পান্না দাসীর কাছে সেও বোধ করি একটু প্রসাদ পেয়েছে।

খেয়েদেয়ে শিবানী ঘরে খিল বন্ধ করে শুলো। রাত তখন মাত্র দশটা। রাত জাগা অভ্যেস, এত সকাল সকাল ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল ইয়াসিনের কথা। লোকটা কি সত্যিই সাপুড়ে? সাপুড়ে এত পয়সা পেলে কোথায়?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল একটা ঝাঁকানি খেয়ে! খোলা জানলার পথে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে বিছানায়। চোখ চেয়ে তাকিয়েই দেখে ইয়াসিন বসে আছে তার শিয়রের কাছে। ধড়মড় করে উঠে বসে চীৎকার করতে গেল শিবানী। ইংগিত ইয়াসিন বললে, চুপ!

—ঘরের খিল খুললে কেমন করে? আর এলেই বা কেন?

ইয়াসিন বললে, খিল কেমন করে খুললাম সে জেনে আর কি হ'বে। আমি এসেছি তোমাকে নিতে। তুমি চল আমার সঙ্গে।

—তোমাকে জানি না। চিনি না। তোমার সঙ্গে গিয়ে কি মরব?

—তা হলে কি তুমি চাও—আমি মরি?

—তুমি মরবে কোন দুঃখে?

ইয়াসিন বললে, তোমাকে ভালবেসে।

—আমাকে ভালবাসো তা' হলে?

—তোমার মনকে শুধোও।

শিবানী বললে, দূর! দূর! তুমি সাপুড়ে।

ইয়াসিন বললে, আমি সাপুড়ে নই। আমার জমি আছে, আমার বাড়ি আছে। তোমাকে এরকম করে ঘুরে বেড়াতে আমি দেবো না। কিছুতেই না।

শিবানী বললে, আমি যদি না যাই?

ইয়াসিন বললে, আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আর বেশি কথা বলবার সময় নেই। তোমার কি আছে নেবে তো নাও সঙ্গে, আর না যদি নেবে তো এমনিই চল।

—কাউকে জানিয়ে যাব না? পান্নাদাসীকেও বলব না?

—না। ইয়াসিন বললে, তুমি ছাড়া দল চলবে না। জানিয়ে গেলে ওই বুড়ী মাগী তোমাকে যেতে দেবে না। কান্নাকাটি করবে।

গয়নাগাঁটি শিবানীর গায়েই ছিল। বাক্স খুলে কয়েকখানা কাপড়-জামা আর টাকা-কড়ি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল ইয়াসিনের সঙ্গে।

ইয়াসিন আসলে সাপুড়ে ছিল না। সাপ খেলানো ছিল তার ছল। সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে বড়মানুষের অন্দরমহলে ঢুকে আট-ঘাট সব জেনে আসত। তারপর সুবিধে বুঝে রাত্রে গিয়ে চুরি করত সেই বাড়িতে। চুরি-ডাকাতি রাহাজানিই ছিল তার পেশা। ছু-ছু'বার জেল খেটেছে ইয়াসিন।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও সে চুরি ডাকাতি করে নাকি?

শিবানী বললে, না। আমাকে নিকে করে ঘর বাঁধবার পর ও-সব কাজ তার বন্ধ করে দিয়েছি। ভাবনা কি আমাদের দশ বিঘে জমি আছে। ও নিজের হাতে চাষ করে। তারপর চাষের কাজ যখন থাকে না, তখন সাপের খেলা দেখায়।

কালীয় নাগের বিষ-দাঁত ভেঙে তখন তাকে ঝাঁপিতে পুরেছে ইয়াসিন।

সবাইকে চা আর ডিমসেদ্ধ খাইয়ে শিবানী বললে, এবার দেখাও তোমাদের সাপ।

সাপটা বোধ করি বেশ কাতর হয়ে পড়েছিল। ঝাঁপির ঢাকাটা খুলে ফেললে ইয়াসিন। কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল সাপটা কিছুতেই মুখ তুললে না।

বাবা বারকয়েক খোঁচা মারলেন হাত দিয়ে।

খোঁচা খেয়ে সে এক সময় ফোঁস করে উঠে দাঁড়াল ফণা তুলে। বারকতক ছোবল মেরেই আবার ফণা গুটিয়ে ঢুকে পড়ল ঝাঁপির ভেতর।

বাবা বললেন' এখন ওর যন্ত্রণা হচ্ছে। চার পাঁচদিন ও ভাল করে মাথা তুলবে না।

শিবানী বললে, যদি এখানে থাকো তো আবার এসো।

বললাম, আসব।

বাইরে বেরিয়ে এসে বাবাকে বললাম, জঙ্গলের ওপারে যে ইস্কুলটা আছে, ওখানে আজ একবার যাবেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে?

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

আস্তে আস্তে—এখানে পড়ব ভাবছি।

—রাণীগঞ্জে কি হলো?

জবাব দিতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন, কিন্তু রোজ এতটা পথ জঙ্গল পার হয়ে যেতে-আসতে কষ্ট হবে না তোমার?

বললাম, না।

এগার

জঙ্গলটাকে এত ভাল করে দেখিনি কোনোদিন। যে পথ দিয়ে গ্রামে ঢুকেছিলাম, এ-পথ সে পথ নয়।

বাবার সঙ্গে যাচ্ছি নাকড়াকোন্দা স্কুলে। যদি দয়া করে হেড মাস্টারমশাই আমাকে ভর্তি করে নেন তাহলে এইখানেই পড়বো। আর ফিরে যাব না রাণীগঞ্জে।

গ্রামের উত্তর দিকের সঙ্গে দক্ষিণ দিকের কোনও মিল নেই। এদিকের ঢেউ খেলানো মাটি শুধু উঠেছে আর নেমেছে। আবার উঠেছে, আবার নেমেছে। দক্ষিণের দিকচক্রবাল আড়াল করে শালের জঙ্গলটা সোজা চলে গেছে পশ্চিমদিকে। তারপর সাঁওতাল পরগণার ছোট বড় অনেকগুলো পাহাড়ের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়গুলো মনে হয় যেন আকাশের গায়ে আঁকা।

পথ চলতে চলতে ঘন-ঘন তাকাচ্ছিলাম সেইদিকে। বাবা বললেন, ওইদিকে বাবার মন্দিরে যেতে হয়।

অর্থাৎ বৈদ্যনাথ ধাম।

—হাঁটা পথে এখান থেকে মাইল তিনেক।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি গেছেন কোনোদিন?

—না আমি যাইনি। আমার বাবা গিয়েছিলেন তাঁরই মুখে শুনেছি। রাস্তা ভাল নয়। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, জঙ্গলে বাঘ নেই?

বাবা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, এখানের জঙ্গলের নীচেটা পরিষ্কার। অ-গাছার ঝোঁপজঙ্গল নেই বললেই হয়। কাজেই এখানে বুনো জন্তু-জানোয়ার থাকতে পারে না। এক-আধটা বাঘ-ভাল্লুক যে আসে না তা নয়। বেশি আসে বুনো-শুয়োর। সাঁওতালেরা তাড়া করে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়। কখনো তাদের হাতে মারা যায়।

এই বলে তিনি একটা ভারি মজার গল্প বলেছিলেন।

বলেছিলেন :

সেবছর তখন মহুয়া পাকবার সময়। গাছ থেকে পাকা মহুয়া টুপ্ টুপ্ করে পড়ছে মাটিতে। সাঁওতালদের মেয়েরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। নিয়ে গিয়ে মদ তৈরি করে।

আমাদের গ্রামের একটা মুচিদের মেয়ে সুখী, একদিন গেল সেই মহুয়া কুড়োতে। সাঁওতালদের বস্তির কাছে গাছের তলায় যাবার উপায় নেই। সাঁওতালদের চোখ এড়িয়ে সে লুকিয়ে চলে গেল বনের ভেতর। শাল মহুয়ার আর হরীতকীর জঙ্গল। গাছের অভাব নেই। দূর থেকে পাকা মহুয়ার গন্ধই বুঝিয়ে দেয় কোথায় মহুয়ার গাছ।

মেয়েটা কিন্তু বিপদে পড়লো সেদিন। হামেশাই তারা এই জঙ্গলে যায়, কখনও শুকনো পাতা কুড়োতে, কখনও হরীতকী আনতে। বুনো কুল, পাকা বৈঁচি, পাকা পিয়াল, কুড়কুড়ি ছাতু, আর লাল চুকুই যখন পাওয়া যায় তখন দল বেঁধে আসে তারা। কিন্তু এমন বিপদে কোনোদিন পড়েনি কেউ।

সাঁওতালদের কেউ পাছে দেখতে পায়, তাই পেছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল মেয়েটা। সবে তখন সকালবেলা। ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে গাছের তলায়; হঠাৎ কিসের যেন একটা শব্দ শুনে একবার চাইলে সেইদিকে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। মহুয়া গাছটার গোড়া ছিল ঝোপ্-ঝোপ্। তার সামনে কয়েকটা শালগাছ আড়াল করে আছে, সেই জায়গাটা যেই সে পেরিয়েছে, আর অমনি এক বিকট চীৎকার করে

দে ছুট! পেছন ফিরে তখন আর তার তাকাবারও ভরসা নেই! মেয়েটা প্রাণপণে ছুটে দম নিলে একেবারে জঙ্গলের বাইরে এসে। ধারে-পাশে কোথাও একটা লোক নেই যে তাকে বলবে। হাঁপাতে হাঁপাতে গ্রামে ফিরে এসে যাকে দেখে তাকেই বলে, একটা ভাল্লুক! হাত দশ-বারো দূরে সে প্রকাণ্ড একটা ভাল্লুককে দেখে এসেছে মহুয়া খেতে।

খবরটা সত্যিই অদ্ভুত!

বাবা বললেন, আমাদের এ-জঙ্গলে ছোট চিতাবাঘ দু'একটা এসেছে শুনেছি, বুনো-শুয়োর প্রায়ই আসে, কিন্তু হরিণ বা ভাল্লুক কখনও এসেছে শুনিনি। সুখী, তোকে আর-একবার যেতে হবে। দেখিয়ে দিবি শুধু।

সুখী কিছুতেই যেতে চাইলে না।

অনেক কষ্টে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুখীকে রাজী করলাম। সুখী তার দাদাকে সঙ্গে নিলে। তার দাদা গোপাল মুচি। কালো কুচকুচে চেহারা। যেমন জোয়ান, তেমনি বলিষ্ঠ। পাকা একটি বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। গ্রামে নেই বন্দুক কারও। খুব ধারালো একটি বল্লম আর একটি ছোরা সম্বল করে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। কাউকে কিছু জানালাম না। জানালে যেতে দেবে না।

এদিকে তখন অনেকেই জেনে ফেলেছে। সুখীর কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে সারা গ্রামে। রাস্তার ধারে জটলা হচ্ছে। লোকজন বসে গেছে ভাল্লুকের গল্প করতে।

তাদের পাশ কাটিয়ে, ধরমতলার ধার বেয়ে উঠলাম এসে বাঁধের পাড়ে। আমার সঙ্গে সুখী আর তার দাদা গোপাল। পেছনে ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি তোমার ভালকাকা হরিদাস আসছে ছুটতে ছুটতে। তার হাতে একটা টাঙ্গি। বললাম, তুই আবার এলি কেন? হরিদাস সেকথার জবাব দিলে না। বললে, চল।

প্রথমে এলাম সাঁওতালদের এই বস্তিটাতে। জোয়ান-জোয়ান মানুষগুলো সব কাজে চলে গেছে। পেলাম মাত্র পনেরো-ষোলো বছরের

কয়েকজন ছোকরাকে, আর পেলাম জন দশ-বারো জোয়ান মেয়েকে। ধন্যি সাহস ওদের! সবাই বেরিয়ে এলো যে যা পেলে তাই হাতে নিয়ে।

হরিদাস বললে, থানায় খবর দিলে ভাল হতো। দু'একটা বন্দুক পাওয়া যেতো।

—খবর দিলেও আসবে না ওরা। আয়।

গরু বাঁধবার লম্বা একটা দড়ির মুখে ফাঁস্ তৈরি করে সাঁওতালদের একটা ছেলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এইটে থাক তোর হাতে। চাইলে দিবি।

সাঁওতালদের মেয়েগুলো আসছে দেখে সুখীর বুকের পাটা বেড়ে গেল। সে সাগ্রহে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

কোনও শব্দ না করে পা টিপে টিপে যাচ্ছিলাম আমরা। চামড়ার খাপের ভেতর ছোরাটা দড়ি দিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছি, বর্শাটা শক্ত করে ধরেছি হাতে। গোপাল একটা ধারালো দা চেয়ে নিয়েছে সাঁওতাল-বস্তি থেকে। হরিদাসের হাতে টাঙ্গি। সাঁওতালদের একজন ছোকরার হাতে তীর-ধনুক, একজনের হাতে দড়ির ফাঁস, আর একজনের হাতে বাজাবার জন্যে ভাঙা একটা ক্যানেস্তারা।

কাউকে কোনও আওয়াজ করতে বারণ করে দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ সুখী আঙ্গুল বাড়িয়ে বলে উঠলো, ওই তো!

বলেই ছুটে সে আমাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম, প্রকাণ্ড একটা ভাল্লুক মহুয়া গাছের তলায় মুখ থুবড়ে শুয়ে শুয়ে থর থর করছে।

সবাই আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি তখন। ভাবছি কি করে কি করা যায়। মুখটা এমনভাবে মাটিতে থুবড়ে আছে যে, ফাঁস্‌দড়িটা ছোঁড়বারও উপায় নেই। পিছলে পড়ে যাবে। ফাঁস্ ছোঁড়া আমার অনেক দিনের অভ্যেস। অনেক বাঁদর ধরেছি আমি ওই ফাঁস ছুঁড়ে।

টুপ্ টুপ্ করে পাকা মহুয়া খসে খসে পড়ছে গাছ থেকে। কয়েকটা পড়লো ভাল্লুকটার গায়ের ওপর। কিন্তু সেদিকে তখন ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। তেমনি মুখ থুবড়ে পড়েই রইলো। ফাঁস লাগানো যাবে না। ছুটে গিয়ে বর্শাটা যদি তার বুকের ওপর বসিয়ে দিই, আর সবাই মিলে একসঙ্গে গিয়ে যদি তাকে আক্রমণ করি, তাহলে কেমন হয়? কিন্তু ভয় ওর ওই বড় বড় নখগুলোকে। ভাল্লুক কেমন করে 'চার্জ' করে জানি না। শুনেছি মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটে আসে। তারপর এসে জাপটে ধরে। তাহলে ওকে উঠতে দেওয়াই ভালো। বুকটা সামনে পাওয়া যাবে।

এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, সাঁওতাল-ছোঁড়াটা মুখে একরকম শব্দ করে—দিলে একটা তীর ছুঁড়ে। তীরটা ভাল্লুকটার গায়ে লাগলো না, একেবারে তার গা ঘেঁষে মাটিতে গিয়ে বিঁধল। আবার আর-একটা তীর সে ছুঁড়তে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় বারণ করলাম। ভাল্লুকটা মাথা তুলেছে। শুয়ে শুয়েই মুখটা ওপরের দিকে তুলে হাঁ করে হাঁপাতে লাগলো। মনে হলো যেন হাঁ করে আছে—দু'চারটে মহুয়া তার মুখের ভেতরে পড়ুক, বোধহয় এমন আশা সে পোষণ করে থাকবে।

আমিও ঠিক এই সময়টায় কাজ সেরে নিলাম। সাঁওতাল ছেলেটার হাত থেকে দড়ির ফাঁসটা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিলাম ছুঁড়ে। টুক্ করে দড়ির ফাঁসটা গিয়ে ভাল্লুকটার গলায় আটকে গেল। কিন্তু তখনো ভয় কমছে না—আল্‌গা ফাঁস, মাথাটা নামালেই গলে পড়ে যাবে। ভয়ে ভয়ে একটু টান দিতেই দেখি দড়ির ফাঁসটা তার গলায় ঠিক বসে গেল।

গলায় টান পড়তেই ভাল্লুকটা উঠলো। গলায় কেমন যেন ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগলো।

মনে হলো এবার সে আক্রমণ করবে।

আমিও চট্ করে আমার হাতের দড়িটা সাঁওতাল ছেলেদের হাতে দিয়ে বললাম, কিছুতেই ছাড়বি না। পেছন দিকে টেনে চিৎ করে ফেল্‌বি। আমি ওর বুকে বর্শাটা আমূল বসিয়ে দেবো।

হরিদাস বললে, ঠিক আছে। আমি ওকে বলিদান করে দিচ্ছি ভাখো।

গোপাল মুখে কিছুই বললে না। চট্ করে মাটিতে শুধু তার হাত দুটো ঘষে নিলে।

সাঁওতালদের সব ছেলেগুলোই মহা উৎসাহে, ধরলে দড়িটা।

কিন্তু সর্বনাশ, দড়িতে যেই টান পড়েছে,—ভাল্লুকটা উঠে দাঁড়ালো।

ঠিক মানুষের মত। মেয়েগুলো চেঁচিয়ে উঠলো। ছেলেগুলো প্রাণের ভয়ে দড়িটা দিলে ছেড়ে। আমাদের আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। এতটুকু অপেক্ষা—যার নিশ্চিত অর্থ মৃত্যু।

একেবারে মুখোমুখি। আমি আমার বর্শাটা তখন দু'হাত দিয়ে তুলে ধরেছি। হঠাৎ আমাদের পেছনে একটা মাদল বেজে উঠলো। সাঁওতালদের একটা ছেলে খবর পেয়ে মাদল বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছে। আমাদের কিন্তু পেছনে তাকাবার অবসর নেই, চেঁচিয়ে যে তাকে বারণ করবো সে উপায়ও নেই। মাত্র এক সেকেণ্ড! আর এক সেকেণ্ড যদি দেরি হতো তাহলে কী যে কাণ্ড ঘটে যেতো কে-জানে। আমিই বর্শাটা ছুঁড়তে যাব, দেখি ভাল্লুকটি নিজেই তার ব্যবস্থা করে নিলে। মাদলের আওয়াজ শুনেই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচতে আরম্ভ করে দিলে।

নাচে আর ঝুম ঝুম করে আওয়াজ হতে থাকে। দেখলাম, তার পেছনের দুটো পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। বাঁদর ভাল্লুক নিয়ে যারা নাচ দেখিয়ে রোজগার করে, তাদেরই কারও পোষা ভাল্লুক হয়তো কোনোরকমে পালিয়ে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

বাবা বললেন, তারপর আর কি। দড়ি ধরে গাঁয়ে নিয়ে গেলাম, ভাত খাওয়ালাম, ডুগডুগি বাজিয়ে নাচালাম, ইচ্ছে ছিল রেখে দেবো

বাড়িতে, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাখতে দিলেন না। বললেন, বনের পশু, ওদের অত বেশি বিশ্বাস কোরো না।

—তারপর ?

—সন্ধ্যেবেলা নিয়ে গেলাম সাঁওতাল পাড়ায়। কাজ থেকে সবাই তখন ফিরেছে। তারা রাখলে। বড় একটা শালের গাছে বেঁধে দিয়ে গেলাম। রোজ বিকেলে একবার করে দেখতে আসতাম। প্রথম প্রথম কুকুরগুলো খুব বিরক্ত করতো ওকে। তারপর দিন চার-পাঁচ পরে একদিন গিয়ে দেখি,—সাঁওতাল-পাড়া খুব সরগরম। যে-যেখানে ছিল সব জড়ো হয়েছে একজায়গায়। গাছের তলায় বিরাট মজলিশ। মদ খাচ্ছে, মাদল বাজাচ্ছে আর চলছে হাসির হুল্লোড়। দেখলাম, ভাল্লুকটা একপাশে শুয়ে শুয়ে কাঁপছে। গলার দড়িটা পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়েছে। কি ব্যাপার ? ব্যাটা যাচ্ছে না কিছুতেই। শুনলাম, মাড়-ভাত ছাড়া সে কিছু খেতে চায় না। একদিন খানিকটা মাংস দেওয়া হয়েছিল, শুঁকে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আধসের চালের মাড়-ভাতে পেট ভরে না। আবার খেতে চায়। রোজ রোজ কে আর ওকে অত খেতে দেবে ? দিন-দুই আগে এক-পেট ভাত খাইয়ে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের ভেতর ভাল্লুকটাকে ওরা ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। আজ নাকি আবার ফিরে এসেছে। দুপুরে সবাই যখন কাজে বেরিয়ে গেছে, সেই সময় দুলন্ মাঝির ঘরে চুপি চুপি এসে ঢুকেছে। মহুয়া সেদ্ধ ছিল একবাটি—সেটা খেয়েছে। মাটির একটা হাঁড়িতে ছিল আধহাঁড়ি মহুয়ার মদ, ছুঁচলো মুখটা হাঁড়ির ভেতর ঢুকিয়ে সেটাও সাবাড় করেছে। তারপর মদ খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে ব্যাটা আজ সারাদিন কি করছে ছাখ ! এই বলে একটা ছেলেকে ইশারা করতেই ছেলেটা একটা কঞ্চি দিয়ে ভাল্লুকটাকে খোঁচা মারলে। গাঁক্ গাঁক্ করে ভাল্লুকটা উঠে বসলো। তারপর যেই মাদল বাজালো, টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে তার সে কী নাচ! নেশায় টলে টলে পড়ছে, তবু তার নাচ থামে না। শেষে বসে বসেই নাচতে লাগলো ঘুরে-ঘুরে।

দিনকতক পরে গিয়ে শুনলাম, ভাল্লুকের মালিক অনেক খোঁজ-খবর করে সাঁওতাল পাড়ায় এসে তাকে নিয়ে গেছে সাঁওতালদের পাঁচটি টাকা দিয়ে।

ভাল্লুক শিকারের গল্প শুনতে শুনতে জঙ্গল পেরিয়ে আমরা নাকড়াকোন্দা ইস্কুলের কাছে এসে পড়লাম। ইস্কুলের তখন ছুটি হয়ে গেছে। গ্রাম থেকে একটুখানি দূরে ফাঁকা একটি কাঁকির-পাথরের ডাঙ্গার ওপর ছোট্ট ইস্কুলের অবস্থা তেমন ভাল নয়। না হলেও পরিবেশটি বড় সুন্দর। আমার খুব ভাল লাগল।

পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছিল খড়ে-ছাওয়া সারি সারি কয়েকটি ঘরের ওপর। বাবা বললেন, এইটি হলো বোর্ডিং হাউস।

ছেলেদের সাড়াশব্দ পেলাম না। ধুপ-ধাপ আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি— সুমুখের মাঠে তারা মনের আনন্দে ফুটবল খেলছে!

আপিস-ঘরের সামনে ছোট একটি শুকনো বাগান। আর সেই বাগানের একধারে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে যিনি বসেছিলেন, বাবা বললেন, উনিই হেডমাষ্টার।

বললাম, আপনি চেনেন ওঁকে?

—খুব চিনি।

কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, কে? কি চাই?

বাবা বললেন, নমস্কার। চিনতে পারছেন না আমাকে?

—আজ্ঞে না। বলেই তিনি চোখ নামিয়ে আবার তাঁর কাজে মন দিলেন। হাতে একটা লাল-নীল পেন্সিল। সমস্ত ছেলেদের খাতা দেখছিলেন।

বাবা তাঁর নিজের পরিচয় নিজেই দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা আর দিতে হলো না। আপিস-ঘর থেকে মোটামত এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বাবাকে দেখেই বলে উঠলেন, মুখুজ্যেমশাই, কি মনে করে? ওরে বংশী, কয়েকটা চেয়ার বের করে দে বাবা।

বংশী চেয়ার বের করতে লাগলো একটি একটি করে।

হেডমাষ্টার মশাই আবার মুখ তুলে তাকালেন। বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বসুন।

অর্থাৎ হরেনবাবুর যখন পরিচিত ব্যক্তি, তখন বসতে না বলাটা অভদ্রতা।

বাবা কিন্তু বসলেন না। হরেনবাবুকে বললেন, হেডমাষ্টার মশাই আমাকে চিনতে পারেন নি বোধহয়।

তাই নাকি? বলে বাবাকে জোর করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তিনি নিজেও বসলেন। তারপর মাষ্টার-মশাইকে বললেন, বলি হ্যাঁ মশাই, থানায় সেদিন ওঁর ছুটো হাতে হাত-কড়া পরিয়ে দিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে রাখলেন। আর উনি হাত কড়া খুলে হাজত থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে হাতকড়াটি আপনার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নমস্কার করলেন। সে-সব কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন কি করে?

হেডমাস্টারমশাই তখন হাতের খাতা পেন্সিল ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসেছেন।—আরে আপনিই মিস্টার মুখার্জি—that great magician! আপনার সে পাগড়ী নেই, পোষাক নেই, চিনতে পারিনি, কিছু মনে করবেন না। ওরে ও বংশী, চট্ করে মুখুজ্যেমশাইকে চা খাইয়ে দে!

বলেই তিনি তাঁর পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটি বাবার হাতে দিলেন, একটি নিজে নিলেন। তারপর দিয়াশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন দেখি আমি কিরকম একটা অপদার্থ মানুষ। তাছাড়া চোখ ছুটো আমার একেবারে গেছে। আপনাকে চিনতে পারলাম না!

বাবা বললেন, আমিও কম অপদার্থ নই। এই দেখুন, সিগ্রেট আমি খেতে পারি না, কাপড়-চোপড় পুড়িয়ে ফেলি।

বলতে বলতে সত্যি সত্যিই বাবার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে

গেল একেবারে হেডমাষ্টারমশাই-এর কাপড়ের কোঁচায়। সঙ্গে সঙ্গে বাবা ঝুঁকে পড়ে কোঁচার কাপড়টা বাঁহাত দিয়ে তুলে ধরলেন। ডান হাতে নিলেন জ্বলন্ত সিগারেটটা। হেডমাষ্টার হাঁ হাঁ করে' হাত বাড়ালেন কাপড়ের আগুনটা নিবিয়ে ফেলবার জন্যে। বাবা বাধা দিলেন। বললেন, দাঁড়ান, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

এই বলে ডান-হাতে-ধরা সিগ্রেটের আগুনটা আরও ভাল করে কাপড়ের ওপর দিয়ে কাপড়টা পোড়াতে আরম্ভ করলেন।

দিশী ধুতিটা চোখের সামনে একটু একটু করে পুড়ছে। হেডমাষ্টারের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না।

হরেনবাবু বললেন, ঠিক আর কোথায় করছেন? কাপড়টা তো দেখছি ভাল করে পোড়াচ্ছেন!

বাবা বললেন, এবড়ো-খেবড়ো হয়ে পুড়ে একটা বিশ্রী রকমের ফুটো হয়ে থাকবে, তাই এই জায়গাটা ভাল করে পুড়িয়ে বেশ গোলমত করে দিচ্ছি। এই দেখুন, এবার বেশ ভাল গোল হয়েছে। ধরুন এবার।

এই বলে আগুনটা হাত দিয়ে টিপে নিবিয়ে, মাষ্টারের কাপড় মাস্টারের হাতেই মুঠো করে ধরিয়ে দিলেন। বললেন, বেশ করে চেপে ধরুন। এইবার আমি কয়েকটা কথা বলবো আপনাকে শুনুন।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, বলুন।

বাবা বলতে লাগলেন কাপড়টা পুড়ে যাওয়ায় আপনার মনে খুব দুঃখু হয়েছে আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু যা হয়েছে, তা হয়েছে আমার দোষে। আমাকে ক্ষমা করুন। যে মুহূর্তে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, দেখবেন সেই মুহূর্তে আপনার মনে আর দুঃখের লেশমাত্র নেই।

হেডমাষ্টার বললেন, ক্ষমা করলাম।

বাবা বললেন, আপনি ভাবছেন আমি বুঝি ম্যাজিক দেখাচ্ছি,

তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন, ক্ষমা করলাম। কিন্তু ক্ষমা করা অত সহজ নয়। আপনি চোখ বুজে সত্যি সত্যি নিজেকে সেই অবস্থায় নিয়ে যান। ক্ষমাসুন্দর মুখখানি আমি দেখলেই বুঝতে পারবো।

সত্যিই চোখ বুজলেন তিনি। হাসতে হাসতে বললেন, ক্ষমা করেছি।

বাবা বললেন, এবার তাহলে দেখুন আপনার কাপড় কতখানি পুঁড়েছে।

দেখা গেল কাপড়ে বিন্দুমাত্র পোড়ার দাগ পর্যন্ত নেই।

হরেনবাবু বলে উঠলেন, আরও কিছু দেখান।

হেডমাষ্টারমশাইও বলে বসলেন, দেখান, দেখান। ভারি সুন্দর ম্যাজিক আপনার। আপনি এই সব দেখিয়ে অনেক টাকা পয়সা রোজগার করতে পারতেন। কেন করেন না কে জানে!

বাবা বললেন, করি তো! অনেক করি।

—কোথায় করেন? শুনেছি তো আপনি কোথাও একটি পয়সা নেন না।

বাবা বললেন, এই যে আপনাদের মনে আনন্দ দিচ্ছি এই তো আমার রোজগার! শুনুন তবে। একবার বেড়াতে বেড়াতে একটা কারখানায় গিয়ে পড়েছিলাম। গিয়ে দেখি দু'জন লোক খুব ঝগড়া আরম্ভ করেছে। ভাষা নিয়ে ঝগড়া। একজন হিন্দুস্থানী আর একজন বাঙালী। আগে থেকে শুনিনি, গিয়ে যখন পড়লাম, তখন দেখি, বাঙালী ছেলেটি একদম কোন্‌-ঠাসা হয়ে পড়েছে। হিন্দুস্থানী ছোকরাটি বলছে, "থামো থামো, তোমরা আর হিন্দী ভাষার নিন্দে করো না। তোমরা জল পান্‌ কর না, জল খাও। ধুম পান কর না। বিড়ি খাও সিগ্রেট খাও।" বাঙালীর নিন্দে সহ্য করা কঠিন হ'য়ে উঠল। বললাম, দাও একটা সিগ্রেট, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে হিন্দুস্থানী ছোকরাটির কাছ থেকে একটি সিগ্রেট চেয়ে নিলাম।

কাপড়-পোড়ার ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে বাবার হাতে যে সিগারেটটা ছিল সেটা নিবে গিয়েছিল। নেবানো সিগ্রেটটা তুলে নিয়ে বাবা দেশলাই চেয়ে ধরালেন। ধরিয়ে সেটা টানতে টানতে বললেন, আমরা যে সত্যিই সিগ্রেট খাই সেটা দেখিয়ে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিলাম। কেমন করে সিগ্রেট খেলাম সেইটে দেখাচ্ছি। আমি আর কথা বলবো না। আপনারা সেই দৃশ্য আর একবার দেখুন।

এই বলে বাবা উঠে দাঁড়ালেন। পোড়া সিগরেটটা টানতে টানতে হঠাৎ একসময় সেই আগুনসুদ্ধ জ্বলন্ত সিগ্রেট জিব দিয়ে মুখের ভেতর নিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেললেন। তারপর জামার পকেটে খালি হাতটা ঢুকিয়ে বের করে আনলেন ঠিক তেমনি একটি জ্বলন্ত সিগ্রেট। সেটাও বারকতক টেনে গিলে ফেললেন। এবার হাত ঢোকালেন হেডমাস্টার মশাই-এর পকেটে। সেখান থেকেও বেরিয়ে এলো ঠিক তেমনি একটা জ্বলন্ত সিগারেট। এমনি করে ক্রমাগত সিগ্রেট টানেন, গিলে ফেলেন, আবার জ্বলন্ত সিগারেট বের করেন যেখান-সেখান থেকে।

হেডমাস্টারমশাই, হরেনবাবু—দু'জনেই অবাক!

আমিও কম অবাক হচ্ছি না। কিন্তু যে-জন্যে এলাম এখানে, সেকথা এখনও বলা হলো না, বাবা ম্যাজিক দেখাতে আরম্ভ করলেন। এদিকে সন্ধ্যে হয় হয়, জঙ্গল পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

তবে ভরসা এই যে, বাবা আছেন সঙ্গে।

বংশী ফিরলো চা নিয়ে। সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবা এসে বসলেন চেয়ারে।

চা খেতে খেতে বললেন, ঐ দেখুন, আসল কথাটাই এখনো বলা হয়নি। আমি এখানে কেন এসেছি, শুনুন।

হেডমাস্টার শুনলেন সব কথা। শুনে বললেন, বেশ বিপদে ফেললেন।

তারপর কি যেন ভাবলেন। একটু কাল ভেবে বললেন, মাইনেও দিতে পারবেন না?

বাবা বললেন, আজ্ঞে না।

হেডমাষ্টার হরেনবাবুর দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করি বলুন দেখি?

হরেনবাবু বললেন, ছেলে যদি ভাল হয় তো নিয়ে নিননা। পাশ করতে পারলে পারসেণ্টেজ বাড়বে।

হেডমাষ্টারমশাই আমার দিকে তাকালেন।

—কি গো, ভাল করে পাশ করতে পারবে তো? এদিকে পরীক্ষার আর খুব বেশি দিন নেই।

বললাম, চেষ্টা করবো।

—চেষ্টা করব নয়। হেডমাষ্টারমশাই বাবার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, আমি একটু পরীক্ষা করে দেখবো আপনার ছেলেকে। যদি বুঝি ছেলে আপনার পাশ করতে পারবে তা' হ'লে আমি ভর্তি করে নেবো।

পরীক্ষার নাম শুনে আমার তখন মনে হচ্ছে—যদিই-বা কিছু আশা-ভরসা ছিল তাও গেল। প্রায় ছ'মাস হতে চললো বই-এর সঙ্গে আমার অহি-নকুল সম্পর্ক স্থাপিত হ'য়েছে।

হেডমাষ্টারমশাই আমাকে কাছে ডেকে বসালেন। এক গাদা খাতা তাঁর হাতের কাছেই ছিল। তাই থেকে কয়েকটা সাদা পাতা ছিঁড়ে আমাকে দিলেন। বললেন, এই পেন্সিল দিয়ে আমি যা বলছি লেখো।

মুখে মুখে তিনি বলে গেলেন, আমি লিখলাম।

লেখা শেষ হলে বললেন, ইংরেজিতে তর্জমা কর।

ভয়ে ভয়ে অনুবাদ করে কাগজগুলি তাঁর হাতে তুলে দিতেই তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, হাতের লেখাটি তো বেশ! হলো কেমন করে?

মৃদু স্বরে বললাম, লিখে লিখে।

তারপরেই আমার অনুবাদটি দেখলেন তিনি। বেশ ভাল করেই দেখলেন। দেখেই কাগজ দুটি হরেনবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, দেখুন তো কেমন হ'লো।

হরেনবাবু আমার অনুবাদটি দেখে আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, মন্দ হয়নি।

বলেই তিনি হেডমাষ্টারকে বললেন, মুখুজ্যেমশাই বলছেন যখন, তখন নিন্ ভর্তি করে। সেদিন বলছিলাম না আপনাকে শহরের ছেলেরা ইংরেজিটা ভাল শেখে। তাছাড়া ইস্কুলটা বেশ নাম করা।

হেডমাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়ি থেকে রোজ আসা-যাওয়া করবে?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একে যদি প্রথম থেকে পেতাম! হেডমাষ্টারমশাই যেন আপনমনেই বললেন, বোর্ডিংয়ে রাখতে পারলে ফল আরো ভাল হ'তো।

জিজ্ঞসা করলাম, বোর্ডিং-এ কত দিতে হয়?

হরেনবাবু বললেন, দিতে তো হয় মাত্র বারো টাকা, কিন্তু তোমার বাবা তো বলছেন মাইনে পর্যন্ত দিতে পারবেন না!

হেডমাষ্টারমশাই বলে দিলেন, কাল থেকেই তুমি আসতে আরম্ভ কর। ভাল করে পাশ করতে হবে।

হ্যাঁ। বলে মাথা নেড়ে দিয়ে চলে তো এলাম সেখানে থেকে, এদিকে কিন্তু বইগুলো সব পড়ে আছে রাণীগঞ্জে।

বই আনতে হবে রাণীগঞ্জ থেকে, ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট আনতে হবে, আর আনতে হবে কিছু টাকা পয়সা।

নজরুলের চিঠি আসবে অণ্ডালের ঠিকানায়। সেখানেও একটিবার যেতে হবে।

বাবাকে বললাম, আমি একবার রাণীগঞ্জ থেকে ফিরে আসি।

বাবা সম্ভবতঃ রাগ করলেন। বললেন, ব্যস, হয়ে গেল? ইস্কুলটা পছন্দ হলো না বুঝি?

বললাম, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আনতে হবে তো!

বই-এর কথাটা তুলতেই পারলাম না। যুদ্ধে চলে যাচ্ছি, কাজেই বই-এর সঙ্গে সম্পর্ক একরকম চুকিয়েই দিয়েছিলাম। কে জানতো যে, আবার এসে আমাকে ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে!

একটু ভেবে বাবা বললেন, চিঠি লিখে দাও, দাদামশাই লোক দিয়ে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেবেন।

রাণীগঞ্জে যাওয়া হলো না। চিঠি লিখলাম রাণীগঞ্জে।

পরের দিন ইস্কুলে যাবার জন্যে সকাল-সকাল খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। সঙ্গে নিলাম সাদা একটি খাতা আর একটি পেন্সিল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। একাই চলেছি ভাবতে ভাবতে। কিন্তু শুধু একখানা খাতা আর পেন্সিল সম্বল করে ইস্কুলে যাওয়া কি উচিত?

খুব চমৎকার দক্ষিণের হাওয়া বইছে শালের জঙ্গলে। একটা গাছের তলায় সবুজ কচি ঘাস গজিয়েছিল।

বসলাম সেইখানে। বসে বসে নজরুলকে একখানি চিঠি লেখা শুরু করলাম।

চিঠিখানি যখন শেষ হলো, ইস্কুলে তখন ছুটির ঘণ্টা পড়ছে।

হঠাৎ সেদিন আবিষ্কার করে ফেললাম—ইস্কুল যাওয়ার চেয়ে মহুয়া গাছের তলায় বসে বসে নজরুলকে চিটি লেখা ঢের বেশি আনন্দের।

পরের দিন পোস্টাপিসে গিয়ে চিঠিখানা ডাকে দিয়ে একবার ভাবলাম যাই ইস্কুলে কিন্তু শুধু একখানা সাদা খাতা আর একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে ইস্কুলে যেতে সে দিনও যেন মন সরলো না। ভাবলাম, বইগুলো আসুক রাণীগঞ্জ থেকে, তারপর ভাল করেই যাব। চিঠি লিখেছি রাণীগঞ্জে—বই-এর সঙ্গে কিছু টাকা যদি আসে তো বোর্ডিং-এ গিয়ে থাকবো।

আমাদের বাড়িটার কথা আগেই বলেছি। বহু পরিবারের বিরাট এক একান্নবর্তী সংসার। বাপ, জ্যেঠা-কাকারা সবাই আপন-আপন শিল্পকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। সবাই দেখি এক অদ্ভুত আনন্দে মশগুল।

প্রথম প্রথম এসে এই বিচিত্র সংসারটির লীলাবৈচিত্র্য আমার খুব ভাল লেগেছিল। এরা সকলেই আমার আপনজন, এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। মনে-মনে গর্ব অনুভব করেছি। ভেবেছি—এদের এই আনন্দ বুঝি নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু মানুষের সঙ্গে জীবন-বিধাতার রসিকতার বুঝি অন্ত নেই। একটানা আনন্দের আনন্দ-যজ্ঞ থেকে ধীরে-ধীরে তাদের তিনি মুক্তি দিতে লাগলেন।

বড় আগুন দপ্ করে জ্বেলে ওঠে। মুহূর্তেই পুড়িয়ে সব ছারখার করে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু ছোট আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি করে।

বিধাতা বোধকরি এখানে বড় আগুন জ্বালাতে সাহস পেলেন না। কারণ বিধাতার রসিকতার জবাব দিতে তারা জানে। এরা আনন্দে মশগুল, আবার দুঃখেও নির্বিকার। তাই চুপিচুপি টিকের আগুন ধরিয়ে দিলেন। নিববে না সহজে, অথচ তলায় তলায় আগুন ঠিক এগিয়ে যাবে।

বুড়ো কর্তাগিন্নি বেঁচে রয়েছেন। ছেলেদের বিয়ে-থা হয়ে গেছে। প্রত্যেকের আলাদা সংসার। খাওয়াটাই শুধু এজমালি। সংসারে অভাব-অনটন একেবারে নেই বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু ছেলেরা প্রত্যেকেই কি যেন এক অদ্ভুত ধাতুতে গড়া। কোনও অভাবকেই তারা কোনোদিন আমল দিতে চায় না।

অথচ বৌয়েরা এসেছে বাইরে থেকে। তারাই দেয় সব গোলমাল করে। বলে, এত কিসের যে আনন্দ তোমাদের কে জানে! আসলে তোমরা হচ্ছ এক একটা আস্ত-কুঁড়ে।

কিন্তু তাই-বা বলি কেমন করে? বাঙ্গালীর সংসার। রোজ মাছ না হলে চলে না। নিজেদের ছোট-বড় বেশ কয়েকটা পুকুর আছে। পুকুরে মাছ আছে। কিন্তু গ্রামে মাছ ধরবার জাল নেই। ভাইদের

ভেতর এক ভাই সে অভাব মিটিয়ে দিয়েছে। নিজের হাতে জাল বুনেছে, ছোট বড় হরেক রকমের ছিপ তৈরি করেছে। কখন যে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, কখন যে সে মাছ এনে রান্নাঘরে ফেলে দেয়—কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

ক্ষেতে কাজ করতে হবে, বাড়ীর লোকজন অন্য কাজে লেগেছে, বাড়তি লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যে-ভাই বেহালা বাজায়, আর যে-ভাই বাটালি নিয়ে কাঠের কাজ করে, বেহালা আর বাটালি ফেলে দিয়ে কোদাল হাতে নিয়ে কোমর বেঁধে তারা ছুটেছে মাঠের দিকে।

মাঠে ধান পেকেছে। জঙ্গলের ধারে বিঘে-পাঁচেক জমির ধান তাড়াতাড়ি কেটে না আনলে সে-ধান আর ঘরে আসবে না। সে-বছর বুনো-শূয়োরের উপদ্রব একটু বেড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে দলে দলে বুনো-শূয়োর এসে মাঠের ধান দিচ্ছে নষ্ট করে।

আমার বাবাকে আমি নিজে দেখেছি—কাস্তে নিয়ে তিনি মাঠে চলে গেছেন। আরও দু' ভাই গেছে তাঁকে সাহায্য করতে। দিনের পর দিন বাবা নিজের হাতে ধান কেটেছেন, এক ভাই আঁটি বেঁধেছে, আর-এক ভাই গরুর গাড়ী বোঝাই করে সেই ধান খামারে এনে তুলেছে।

যাক্‌গে সে-কথা। এবার নিজের কথা বলি।

ইস্কুলের বোর্ডিং-হাউসে থাকতে পারলেই বেশ ভাল হয়। তার জন্য টাকার দরকার। বইগুলো পড়ে আছে রাণীগঞ্জে। নজরুলের চিঠি আসবে অণ্ডালের ঠিকানায়।

দাদামশাইকে চিঠি লিখেছিলাম। আজ পর্যন্ত তার কোনও জবাব এলো না। নিজেই চলে গেলাম অণ্ডালে।

যাওয়া মাত্র দিদিমার কাছ থেকে পেলাম নীলরঙের চমৎকার একখানি খামের চিঠি। নজরুল লিখেছে। নৌশেরা থেকে তারা এসেছে করাচিতে। চমৎকার জায়গা। খুব দুঃখু করে জানিয়েছে—তুমি যদি সঙ্গে থাকতে। বড় বড় চার পাতা জোড়া সে এক বিরাট চিঠি।

অবনীকে বললাম, চিঠিখানা আমাকে পাঠিয়ে দিস্‌নি কেন ?

অবনী বললে, আমার বয়ে গেছে। তুই বাপের বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকবি, আর আমি তোর চিঠি পাঠাব। হুঁ—

বুঝলাম, রাগ করেছে। বললাম, আমার বইগুলো রাণীগঞ্জ থেকে এনে দিবি ? আমি নাকডাকোন্দা ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি। বই নেই, পড়াশোনা একেবারেই হচ্ছে না, ভারি বিপদে পড়েছি ভাই।

অবনী আমার সম্পর্কে মামা। কিন্তু 'মামা' বলে জীবনে কোনো-দিনই তাকে ডাকিনি। মাস পাঁচ-ছয় আগে-পিছে জন্মেছি একই বাড়ীতে, মানুষ হয়েছি একসঙ্গে, একরকমের জামাজুতো পরেছি, একসঙ্গে খেয়েছি, শুয়েছি, ঘুমিয়েছি, একই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি; ঝগড়া করেছি, মারামারি করেছি—আবার কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারিনি।

তাকেই আবার বলব মামা।

অনেক করে বললাম অবনীকে—'দে না ভাই বইগুলো এনে।'

অবনী বললে, সে যেতেও পারবে না, বইও আনতে পারবে না।

আমাকেও নিষেধ করলে। বললে, তুইও যাস্‌নি। রায় সাহেব খুব রেগেছে আমাদের ওপর।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোর ওপর রাগবে কেন? তুই কি করেছিস ?

অবনী বললে, আমিও তো রাণীগঞ্জ থেকে পালিয়ে এসেছি। আর যাইনি।

বললাম, এখানে বসে বসে ইস্কুল কামাই করছিস ? পাশ করতে পারবি তো ?

অবনী বললে, ভেবেছি আর পড়বো না।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এও মনে হলো যেন আমারই অপরাধ।

লেখাপড়ায় অবনী বিশেষ ভাল কোনোদিনই ছিল না। ইস্কুল

না যেতে পারলেই যেন বাঁচতো। তবু আমি থাকলে হয়ত-বা সে এমন করে' পড়া ছেড়ে দিয়ে বাউণ্ডেলে হ'তে চাইতো না।

রায় সাহেব খুব রাগ করেছেন সেকথা দেখলাম 'সবাই জানে। রাণীগঞ্জ যেতে ভরসা হলো না।

দিদিমা বললে, নাকড়াকোন্দা ইস্কুলে ভর্তিই যদি হয়েছিস্ তো এখানে বসে বসে দিনগুলো নষ্ট করছিস্ কেন?

বললাম, কিছু টাকা পেলে ভাল হতো। বোর্ডিং-এ থাকতাম।

দিদিমা বললে, আমার কাছে এই তিরিশটে টাকা আছে। নিয়ে যা।

তিরিশটি টাকা নিয়ে চলে আসছিলাম, অবনী বললে, পড়ে কি হবে রে? তুইও যেমন।

কি হবে তা কি ছাই আমিই জানি!

অবনী বললে, আমার এই খান্-চারেক্ বই আছে, দরকার হয় তো নিয়ে যা। আমার দরকার হলে তোর বইগুলো নেবো।

অবনীকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু চলে এলাম।

বার

কোন্‌দিক দিয়ে কি যে ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। সারা পৃথিবীটা কেমন যেন বিস্বাদ হয়ে গেল।

নজরুলের চিঠিখানা কতবার যে পড়লাম তার শেষ নেই। সেও লিখেছে তার ভাল লাগছে না।

বোর্ডিং-হাউসে থাকবার জন্য টাকা নিয়ে এলাম কিন্তু বোর্ডিং-এ না গিয়ে আবার ইস্কুলে যাবার পথে সেই শালের জঙ্গলে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মহুয়া গাছের তলায় গিয়ে বসলাম চিঠি লিখতে। চিঠি লিখলাম নজরুলকে। চিঠি লিখলাম অবনীকে। চিঠি লিখলাম যতীনকে। অনেকদিন পরে দিদিকে মনে পড়লো। মনে হলো যেন দিদির কাছে গিয়ে দু'দিন থেকে আসি। অশান্ত মন হয়তো একটুখানি শান্তি পাবে।

সাপুড়ে ইয়াসিনের বৌ শিবানীও তো যেতে বলেছিল!

রবিবার ইস্কুলের ছুটি। ভাবলাম শিবানীর কাছেই যাব। কিন্তু কোথাও গেলাম না।

গেলাম যেখানে—সেখানে যেন না গেলেই ভাল হতো।

আমার বিমাতার বাপের বাড়ি থেকে একখানা চিঠি এসেছিল—তার খুড়তুতো ভাই-এর পৈতে হবে, যেতে লিখেছিল।

মা'র যাবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু বাবা বললেন, তিনি নিয়ে যেতে পারবেন না তাঁর অনেক কাজ এখন।

মা তখন আমার শরণাপন্ন হলো। বললে, যাবি আমাকে নিয়ে?

বোলপুরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতন দেখে ফিরে আসবি।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন!

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললাম।

বললাম, যাব।

মা'র বাপের বাড়ি যেতে হলে বোলপুর হয়ে যেতে হয়। বোলপুরে তাদের মস্ত বড় চালের গদি-বাড়ি। সেখান থেকে অনেক দূরের এক গ্রাম—বীরভূমের একেবারে শেষ সীমানা। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে অফুরন্ত সেই পথ! গরুর গাড়ি চড়ে একবার গিয়েছিলাম। তখন আমি খুব ছোট। এখনও মনে আছে। বর্ষাকাল। একসঙ্গে দশ পনেরো জোড়া গরুর গাড়ি চলেছে সারি দিয়ে। গরুর গলায় ঘণ্টা বাজছে। কখন বেরিয়েছে মনে নেই, কখন পৌঁছোবো তাও জানি না। সে এক ভারি মজার অভিজ্ঞতা।

আমার সেই কিশোর কালের বিচিত্র অভিজ্ঞতা—সেই রহস্যময় স্বপ্নময় বৈচিত্র্যের আস্বাদ আর-একবার পাবার জন্য মন আমার বুঝি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো।

মাকে নিয়ে গেলাম বোলপুর। সঙ্গী জুটলো দুর্গামামা। আমারই সঙ্গে সে বছর সেও দেবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। শান্তি-নিকেতন দেখে চলে গেলাম সেই গ্রামে।

গ্রাম থেকে ফিরতে লাগল পুরো একটি মাস। নিয়ে এলাম প্রচুর আনন্দ আর তার সঙ্গে উপরি পাওনার মত—ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়ার নামই শুনেছিলাম। সে যে কেমন বস্তু, কতখানি তার পরাক্রম, কিছুই আমার জানা ছিল না। এবার জানলাম বেশ ভাল করে। পুরো একটি বৎসর সে আমার নিত্য সঙ্গী হয়ে রইলো। মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশটা দিন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়।

ম্যালেরিয়া নিয়েই টেস্ট পরীক্ষ দিলাম সিউড়িতে গিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে এলাম।

পরীক্ষা দিয়ে আর দাঁড়ালাম না—পালিয়ে গেলাম অণ্ডালে।

ভেবেছিলাম ম্যালেরিয়া বোধহয় এবার আমাকে পরিত্যাগ করবে। কিন্তু পরিত্যাগ করা দূরে থাক, এবার সে আমাকে এমন জোরে চেপে ধরলো যে, জীবনের আশাই ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে এলো।

সেইরকম অবস্থাতেই খবর পেলাম আমি পাশ করেছি।

পাশ করতে পারব সে আশা ছিল না। বোধ করি সেই আনন্দেই জ্বর ছেড়ে গেল। ভাবলাম, ভাল হয়ে গেছি। নজরুলকে খবরটা দিয়েই এলাম কলকাতায়। কলেজে ভর্তি হলাম। বইও কিনলাম যথারীতি।

তখনও একটি মাস বোধহয় পার হয়নি। শরৎচন্দ্রের একখানি বই আর এককপি ভারতবর্ষ (মাসিক পত্রিকা) কিনে এনেছিলাম। আরাম করে পড়ব বলে যেই বসেছি, সর্বাঙ্গ শির শির্ করে শিউরে উঠলো। শীতে ঠক্ ঠক্ করে বিরামহীন ভাবে কাঁপতে লাগলাম। বুঝতে দেরী হলো না—শরীরের প্রতিটি শিরায় শিরায় কার আগমনবার্তা ঘোষিত হলো।

সারাটা রাত কেমন করে কোনদিক দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। সকালের দিকে জ্বর ছেড়ে গেল ঘাম দিয়ে। শরীর অত্যন্ত দুর্বল। কঙ্কালসার চেহারা।

মামা এসেছিলেন কলকাতায়। বললেন, পড়তে হবে না তোকে। বাড়ি চলে যা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার ফিরে গেলাম অণ্ডালে।

দেখলাম, নজরুলের চিঠি এসেছে। আমার পাশের খবর পেয়ে আনন্দিত হয়ে লিখেছে, "তোমাকেও একটা আনন্দের খবর দিই। এখান থেকে কলকাতার কয়েকটা কাগজে গল্প পাঠিয়েছিলাম। একটাও ফিরে আসেনি। সব ছাপা হ'য়েছে। 49th Regiment-এর

একজন বাঙালী সৈনিক করাচি ক্যান্টনমেণ্ট থেকে লেখা পাঠাচ্ছে দেখে বোধহয় ভয়েই ছেপে ফেলেছে। এন্তার লিখছি এখানে বসে বসে।”

কিছুদিন পরে ‘মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’ নামে একখানি ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা নজরুল আমাকে পাঠিয়ে দিলে। দেখলাম, তাতে নজরুলের একটি গল্প ছাপা হয়েছে। চিঠিতে লিখেছে, ‘আমি ‘ল্যান্স নায়েক’ হয়েছি।’

আরও কিছুদিন পরে জানালে, ‘এখন আমি হাবিলদার।’

আমি লিখলাম, ‘বহুত বহুত সালাম হাবিলদার-সাহেব! এবার চুটিয়ে একটা কবিতা লিখে পত্রিকায় পাঠিয়ে দাও। গল্প আর লিখো না।’

জবাবে নজরুল জানালে, ‘কবিতাও লিখেছি দু’ একটা। কিন্তু পাঠাতে ভরসা হয় না। আমার কবিতা বোধহয় ছাপবে না।’

আমার নিজের তখন ইচ্ছে করছে—কবিতা ছেড়ে দিয়ে গল্প লিখি।

কিন্তু লিখবে কে? ঠিক নিয়ম করে একদিন পরে পরে জ্বর আসছে। পেট-জোড়া পিলে, মাথার চুলগুলো সব উঠে গেছে।

কলকাতা যাবার জন্যে ছটফট্ করছি। কিন্তু কেউ আমাকে যেতে দিচ্ছে না। জ্বর ঠিক নিয়মিত আসছে বটে, কিন্তু জ্বরের জোরটা তখন অনেকটা কমে এসেছে।

মামা অবশ্য বলছে, জ্বরের জোর কমেনি, তোমার জীবনীশক্তি কমেছে।

রায়-সাহেবের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখছি না ভয়ে। তিনিও বোধকরি কোনও খোঁজ-খবর নিচ্ছেন না বিতৃষ্ণায়।

নজরুল লিখলে, এবার দিনকতকের ছুটি পেতে পারি। কিন্তু যাব কোথায়? তুমি যদি কলকাতায় থাকতে, সেখানে গিয়েই উঠতাম। আমাদের গ্রামে গিয়ে দু’একদিনের বেশি থাকতে পারব না। অণ্ডালে

যদি থাকো তো অণ্ডালেই যাব। ঠেঙিয়ে তোমার ম্যালেরিয়ার ভূতকে আমি ভাগিয়ে ভিটে ছাড়া করে আসব।

এই চিঠি পাবার পর ডাক্তার দেখাবার ছুতো করে চলে গেলাম উখরায়। মামা থাকতেন সেখানে। জোর করে তাঁকে ধরে বসলাম—কলকাতায় যাব।

মামা বললেন, মিছেমিছি যাবে। এবছর কলেজে তোমার পার্সেণ্টেজ্ থাকবে না। তার ওপর এই শরীর।—বাড়াবাড়ি হলে দেখবে কে?

বললাম, কালীমামাকে লিখে দাও। (প্রখ্যাত কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত—মামার অকৃত্রিম বন্ধু। তখন মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্র)।

মামা বললেন, কলকাতা তোর খুব ভাল লেগেছে বুঝি?

মুখ ফুটে সকথা বলবার দরকার হলো না। বলবার যা প্রয়োজন হলো—তা অন্য কথা।

রায়সাহেবের সংসারে তখন একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্বার্থান্ধ মানুষের চিরন্তন সমস্যা। সে সব কথা এখানে অবান্তর।

বললাম, চুপচাপ বসে না থেকে এই সময়টার কিছু একটা শিখে নিতে চাই।

—কি শিখবি?

শেখবার ইচ্ছে তো অনেক-কিছু। চেয়েছিলাম ডাক্তারী শিখতে। কিন্তু এখন সে ইচ্ছে অবান্তর। বললাম, তাড়াতাড়ি শিখতে হলে একমাত্র শর্টহ্যাণ্ড-টাইপরাইটিং শিখে ফেলতে পারি।

উখরা-এস্টেটের ম্যানেজার ৺কুঞ্জবিহারী দত্ত মশাই-এর ছোট ভাই বিনোদ তখন কলকাতায় টেলারিং শিখছে। বাগবাজারে কাশিমবাজারের মহারাজার বিরাট পলিটেকনিক্ ইন্সটিটিউট্। তার প্রিন্সিপ্যাল বৃদ্ধ পিটাভেল সায়েব। শর্টহ্যাণ্ড-টাইপ্ রাইটিং শেখবার ব্যবস্থা আছে সেখানে। বললাম সে কথা।

মামা নিজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সেইখানে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। বিরাট তিনতলা বাড়ি। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব থাকেন তিনতলায়। দোতলায় ছেলেদের বোর্ডিং। নীচের তলায় ক্লাস।

ব্যবস্থা মন্দ হলো না। একবাড়িতেই সব কিছু। বিনোদ থাকে পাশের সিটে। মামা বলে দিয়ে গেলেন, একে একটু দেখো। ওর শরীর ভাল নয়।

আমাকে বললেন, কালীবিঙ্করকে সব বলে গেলাম। নিয়মিত টনিক খাবে। টাকার দরকার হলে চিঠি লিখবে।

বিনোদ হলো আমার গার্জেন। টেলারিং শিখতে তখন তার মোটেই ভাল লাগছে না। সব কাজ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ফুটইঞ্চি মাপবার ফিতেটা কাঁধে ফেলে, মস্ত বড় একটা কাঁচি দিয়ে পুরনো খবরের কাগজ কাটতে কাটতে হাত বেঁকে গেলে কাঁচিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে, দুত্তোর কাগজ কেটে টেলারিং শেখা যায় না, কাপড় কাটতে হয়।

কিছু একটা না বললে চলে না। বলি কাপড় কাটার খরচ আছে।

বিনোদ বলে ধেৎ তেরি খরচ। এক ভাই হ'লো ডেপুটি ম্যাজিস্টেট্র, এক ভাই হলো সার্কেল অফিসার, আর আমি হব কিনা দর্জি! তার চেয়ে গরম চা খাওয়া যাক একপেয়ালা।

চাকরকে দু'পেয়ালা চা আনতে দিলাম।

বিনোদ বললে, খালি পেটে চা খাবো না। বিস্কুট আনতে দাও।

বললাম, খরচ বেশি হয়ে যাবে যে!

বিনোদ বললে, হয় হবে। দেখা যাবে মাসের শেষে।

একজন দাদার ভাই, একজন মামার ভাগ্নে। ভাবনা কি।

বিনোদ আমাকে নানারকম উপদেশ দেয়। বলে, কী ছাইভস্ম লিখছ দিনরাত! অত লিখো না। চোখ খারাপ হয়ে যাবে। তবে

কলকাতা শহর, ভাববার বিশেষ কিছু নেই। আমার চেনা একজন চোখের ডাক্তার আছে। চোখ দেখিয়ে দেবো, পয়সা লাগবে না।

তবু আমার লেখা বন্ধ হলো না দেখে আবার বললে চোখ যদি ভাল রাখতে চাও তো লেখাপড়া বন্ধ রেখে চোখ বুজে শুয়ে থাকো। ঘুমোতে যদি পাব তো কথা নেই শরীরও ভাল থাকবে।

বিনোদের ঘুম দেখে ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারি না।

তবে এ'টা বড় বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। এত ঘুমিয়েও, বিনোদ তার চোখদুটিকে রক্ষা করতে পারলে না। তারই চোখ হলো খারাপ আগে। ডাক্তার চশমা ব্যবস্থা করে দিলে।

বাগবাজার স্ট্রীটের ওপর তখন রেলের লাইন পাতা। মালগাড়ি চলে তার ওপর দিয়ে। বিনোদ আমাকে সাবধান করে দিলে। বললে, দু'দি.॰ তাকিয়ে রাস্তা চলবে। ট্রেনের তলায় ছাগল কাটা পড়ছে হরদম।

লাইন ধরে পশ্চিমদিকে গেলেই গঙ্গা। রোজ সকালে উঠে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করতে আরম্ভ করলাম। বিনোদ একেবারে হৈ হৈ করে উঠলো।

—সর্বনাশ করলে তুমি। ম্যালেরিয়ার রুগী, ঠাণ্ডা লাগলেই নিমোনিয়া। দাঁড়াও, তোমার মামাকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি আচ্ছা করে।

চিঠি অবশ্য সে লেখেনি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, গঙ্গাস্নান করেই কিনা জানি না, আমার ম্যালেরিয়া সেরে গেল। পালা জ্বর বন্ধ হলো। শরীরের ওজন কিছু বাড়লো। মাসখানেকের ভেতরেই একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলাম।

সবই তো হলো। কিন্তু যার জন্যে কলকাতায় এলাম, সে কোথায়?

নজরুল জানে আমি কলকাতায় এসেছি। বাগবাজারের ঠিকানায় চিঠির জবাবও পেয়েছি। কিন্তু ইদানিং মাসখানেক তার কোনও

চিঠিপত্র না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় দেখি, একটা রিক্সায় চড়ে নজরুল এসে হাজির। চমৎকার চেহারা হয়েছে নজরুলের। মাথায় চুল রেখেছে, বুকের ছাতি হয়েছে চওড়া, পায়ে বুট জুতো, খাঁকি প্যাণ্ট, খাঁকি সার্ট,—মানিয়েছে সুন্দর। পাশ বালিশের মত একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দোতলায় উঠে এলো গটমট করে।

সাতদিনের মাত্র ছুটি। তিনদিন থাকবে কলকাতায়। তারপর যাবে চুরুলিয়া। ওই পথেই চলে যাবে করাচি। কলকাতায় আর ফিরে আসবে না।

কতদিন পরে দেখা। কথা আর আমাদের শেষ হতেই চায় না!

কত কথা শুনলাম। কত কথা বললাম। একসঙ্গে গঙ্গার স্নান করলাম। পাশের বাড়ি থেকে একটা হারমোনিয়াম চেয়ে এনে তার গলায় গান শুনলাম। ট্রামে চড়ে সারা কলকাতা চষে বেড়ালাম। তখনকার দিনের চার আনার টিকিটে বায়োস্কোপ দেখলাম। টিকিটের দাম বেশি বলে থিয়েটারটা আর দেখা হলো না। সেজন্যে আফসোস হলো। তারপর গেলাম ৩২, কলেজ স্ট্রীটের দোতলায়, মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার আপিসে। এই পত্রিকাটি নজরুল আমাকে আগেই পাঠিয়েছিল আর লিখেছিল—জনাব মুজাফ্ফর আহ্মদের কথা। তিনিই নাকি সবার আগে তার লেখা সাগ্রহে ছেপেছেন। চিঠি-পত্রে তাঁর সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ও হয়েছে ঘনিষ্ঠ। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করবার আগ্রহ আমারও বড় কম ছিল না। সুতরাং চলে গেলাম নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে।

গিয়ে দেখলাম—অপূর্ব সুন্দর একটি মানুষ। গৌরবর্ণ শীর্ণকায় সংযতবাক যে যুবকটিকে সেদিন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, আজও তিনি আমার স্মৃতিপটে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেদিন তাঁরও বিশেষ কিছুই আমি জানতাম না। আমিও ছিলাম এক পরিচয়হীন

আগন্তুক মাত্র। নজরুল ইসলামের একজন সহপাঠি বন্ধু। কথা যা হয়েছিল নজরুলের সঙ্গেই হয়েছিল। আমি ছিলাম তার নীরব শ্রোতা এবং নীরব দর্শক।

নজরুলের প্রতি তাঁর সেই সহৃদয় ব্যবহার, তাঁর সেই উদার দাক্ষিণ্য, তাঁর মুখের শুধু দুটি-চারটি কথা, প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখচ্ছবি আর একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাকে সত্যই সেদিন মুগ্ধ করেছিল।

নজরুল চলে যাবার পর, একটি দিনের এই একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা আমি অনেকবার ভেবেছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি এই ব্যক্তিটিকে। তখন কতই-বা আমার বয়স। আর ক'টি মানুষকেই-বা এমন করে দেখেছি। অথচ—

নজরুলকে যে ভালবাসে, সে আমারও প্রিয়—এই কথা ভেবেই জীবনের পাতাটা সেদিন উল্টে রেখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী জীবনে সে-পাতা আমাকে আবার খুলতে হয়েছে। লাল কালির দাগ দিয়ে এই বিশেষ দিনটিকে সবিশেষ করে রেখেছি। আজ আমার জীবন-সায়াহ্নে এসে দেখছি—সে-দাগ এখনও তেমনি অম্লান হয়ে রয়েছে।

তিনটি মাত্র দিন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। একেবারে নিমিষে।

হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে এলাম নজরুলকে। আবার কতদিন পরে দেখা হবে কে জানে।

সেখানে গিয়ে চিঠি দেবে বলেছিলো—দিলে না পুরো একটি মাস, পরে বেগুনীরঙের কালিতে লেখা উদ্বিগ্নতায় ভরা একখানি চিঠি পেলাম। নজরুল লিখেছে, তাদের ঊনপঞ্চাশ বায়ুগ্রস্ত বাঙালী পল্টন ভেঙে দেবার কথা চলেছে। ভেঙেই যদি দেয় তো—'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা? আমার সেই পাশ বালিশটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে সোজা উঠব গিয়ে তোমার আস্তানায়। তারপর যা থাকে কপালে!

নজরুল আসবে জেনে আনন্দও যেমন হলো, তার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে রাত্রে ভাল ঘুমও হলো না। সত্যিই তো। কি করবে সে? কোথায় যাবে, কি করবে? কোথায় থাকবে? হঠাৎ আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো—বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলার সেই ঘরখানি। মুজাফ্ফর আহমদ-সাহেব বলেছিলেন, চলে তো আসুন এইখানে। তারপর দেখা যাবে।

ছোটখাটো মানুষটি, কিন্তু তাঁর হৃদয় যে এত বড় তখন সেকথা ভাবতে পারিনি। তাই তাঁর কথাটাকে তেমন আমল দিইনি। নজরুলের জন্য শুধু শুধু ভেবেই মরেছিলাম।

আমাদের পলিটেকনিকের কমার্স ডিপার্টমেণ্ট আর বোর্ডিং হাউস সে-বাড়ি থেকে উঠে এলো রামকান্ত বোস স্ট্রীটে। (সেই পুরনো বাড়িটা ভেঙে এখন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ হয়েছে)।

নজরুলকে নতুন বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখলাম। ভূপেন্দ্র বোস এ্যাভিনিউ তখন হয়নি। ট্রাম থেকে নেমে কোনদিক দিয়ে কেমন করে আসতে হবে তাও জানিয়ে দিলাম। চিঠিতে।

শেষ পর্যন্ত এলো নজরুল। পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর সে ফিরে যাবে না। চেহারা তার আরও ভাল হয়েছে। হো হো করে হাসির জোর যেন আরও বেড়েছে।

আমাদের হোস্টেলে 'অতিথি' হয়ে থাকার কোনও অসুবিধা ছিল না। গেষ্ট চার্জ মাসের শেষে দিতে হয়। তার ওপর একখানা ফাঁকা সিটও পাওয়া গেছে ঠিক আমাদের সিটের পাশেই। আনন্দের হাট বসে গেল আমাদের 'রুমে'। নজরুলের সেই মন-মাতানো অফুরন্ত হাসি আর গান, যৌবনোচ্ছল প্রাণের প্রাচুর্য একে একে টেনে আনলে সবাইকে। প্রথমে এলো আমার সেখানকার সহপাঠী বন্ধুরা; তারপর এলেন বয়স্ক শিক্ষকেরা।

'তিন চারটে দিন আমরা হোষ্টেল ছেড়ে একেবারে কোথাও

গেলাম না। যাবার সময়ই বা কোথায়? গঙ্গায় স্নান আমার তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যালেরিয়ার কথা ভুলেই গেছি।

একদিন রাত্রে পাশাপাশি সিটে আমরা শুয়ে পড়েছি। ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। গল্প করছি শুয়ে শুয়ে। নজরুল চুপি চুপি বললে, একটা চাকরি পাওয়া যেতে পারে।

কথাটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের চাকরি?

নজরুল বললে, পল্টনে যারা একটু নাম-টাম করেছে, গভর্নমেণ্ট তাদের কিছু কাজকর্ম দেবে।

বললাম, তোমাকে কি কাজ দেবে? তুমি তো ম্যাট্রিকও পাশ করলে না।

—নাই-বা করলাম! কত কাজ আছে। যা হোক একটা হয়ে যাবে।

—তুমি নেবে সেই কাজ?

—না নিলে খাব কি?

বলেছিলাম, ভিক্ষে করে খাবে।

নজরুল হো হো করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, ঠিক বলেছ। একটা হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় যদি গান গেয়ে বেড়াই তো রোজগারের ধান্দা দূর হয়। কি বলো?

—সঙ্গে যদি একটা সুন্দরী মেয়ে থাকে তো রোজগার আরও বেশি হবে।

—সেটা আর পাচ্ছি কোথায়?

—তোমার হাসির চোটে পাশের বাড়ির জানলাটানলাগুলো যেরকম খুলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন জুটতে খুব দেরি হবে না।

বয়সের ধর্মে কথার ধারাটা সেদিন অন্যদিকে গড়িয়ে গিয়েছিল।

তার পরের দিনই বোধহয় নজরুল আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, তুমি মরতে এ-সব শিখতে এলে কেন? চাকরি করবে নাকি?

চিঠিতে তাকে কিছু-কিছু জানিয়েছিলাম, তবু সে জিজ্ঞাসা করলে কেন, বুঝতে পারলাম না। বললাম, জানো তো সবই।

নজরুল বললে, এই জন্যেই বড়লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এরা ঠিক মানুষ নয়।

বললাম এরা বড় মানুষ নয়, বড় অ-মানুষ।

নজরুল হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, মদের মাতাল যেমন, তেমনি এরা হলো টাকার মাতাল।

সেইদিনই একটা কাণ্ড ঘটলো। নীচে ছিল খাবার ঘর। আমরা নীচে না গিয়ে খাবারটা ওপরের ঘরে আনিয়ে নিতাম। খাওয়াদাওয়ার পর বসে বসে গল্প করছি, হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে কোরো না যেন।

বললাম, বলুন।

তিনি বললেন, তোমার এই বন্ধুটি কতদিন থাকবেন এখানে?

তাঁর জিজ্ঞাসার ভংগিতে আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। বললাম, কেন বলুন তো?

কথাটা বলতে বোধকরি তিনি সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। বললেন, এখানেও তো তোমাকে গেষ্ট্ চাজ দিতে হবে, তার চেয়ে ওঁকে যদি বাইরের কোনও হোটেলে খাইয়ে আনো তাহলে বোধহয় তোমার খরচ অনেক কম পড়বে, খাওয়াটাও হয় তো ভাল হবে।

বলবার উদ্দেশ্য কিছুটা বুঝতে পারলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, মুসলমান বলে কি কোনও কথা উঠেছে?

তিনি বললেন, না তেমন কিছু নয়। চাকরটা শুনেছে উনি মুসলমান। তাই ওঁর এঁটো বাসন সে ধুতে চাচ্ছে না।

আমি ধুয়ে দিচ্ছি। বলে চলে এলাম ওঁর ঘর থেকে।

আমাদের ঘরে এসে দেখলাম, আমাদের দু'জনের এঁটো বাসন তখনও তোলা হয়নি। বিনোদ চলে গেছে ক্লাস করতে। নজরুল একা একটা সিটের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে। মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনও শব্দ না করে চুপিচুপি জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললাম।

দুপুরে ঘণ্টা-দুই-এর জন্যে আমাদের একটা ক্লাস বসতো। জামাটা গায়ে দিয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে নীচে যাবার আগে বললাম, ঘুমোলে নাকি? আমি ক্লাসে যাচ্ছি।

চোখ বুজে তেমনি শুয়ে শুয়েই নজরুল বললে, যাও।

ক্লাসে সেদিন কোনও কাজই করতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম নজরুলকে নিয়ে আমিও আজ চলে যাব এখান থেকে। কুড়ি নম্বর বাদুড়বাগান রো'তে (আজকাল ১, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট) রায়-সাহেব বাড়ি কিনেছেন একখানা। বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। নীচের একখানা ঘরে কেবলমাত্র একজন দারোয়ান থাকে। সেইখানেই গিয়ে উঠবো।

ক্লাসের ছুটির পর উপরের ঘরে গিয়ে দেখি, নজরুল তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে বসে আছে। যেন বেরিয়ে যাবে এখুনি।

যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। নজরুল নিশ্চয়ই ঘুমোয়নি, জেগে জেগে দেখেছে—আমি তার এঁটো থালা বাটি তুলে নিয়ে গেছি। ভালই হয়েছে। বললাম, দাঁড়াও, আমার বিছানাটা বেঁধে নিই। দু'জনে বাদুড়বাগানের বাড়িতে গিয়ে উঠবো এক সঙ্গে।

নজরুল বললে, না। দু'জনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি পরে এক দিন যেয়ো। আমি আজ কলেজ স্ট্রীটে যাই।

৩২, কলেজ স্ট্রীটে মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ-সাহেব মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করলেন নজরুলকে। তিনি যেন তারই প্রতীক্ষায় বসেছিলেন।

জীবনে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে, কেন ঘটলো ভাবতে গেলেই রীতিমত অবাক হয়ে যেতে হয়।

নজরুলকে কলেজ স্ট্রীটে রেখে বাগবাজারে ফিরে আসছি। ট্রাম ধরতে হলে রাস্তাটা পেরিয়ে মেডিকেল কলেজের ফুটে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। কেন জানি না, রাস্তাটা আর পেরোলাম না। না পেরিয়েই গোলদীঘির ফুটপাথ ধরেই এগিয়ে আসছি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

তখনও হয়নি। হ্যারিসন রোডটা সবে পেরিয়েছি, হঠাৎ আমার পিঠের ওপর কে যেন একটা কিল মারলে। থমকে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকিয়েই দেখি—যতীন। হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, বেশ ছেলে বাবা! কোথায় ছিলি এতদিন?

বললাম, এখানেই থাকি, তুই কি করছিস, কোথায় আছিস, তাই বল আগে।

যতীন বললে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আপাততঃ শ্রীরামপুর কলেজে পড়ছি। আর তুই?

যতীন আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, আমি পড়ছি না।

কথাটা সে একেবারেই বিশ্বাস করলে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কেমন আছে?

যতীন বললে, বলবো না। দিদি তোর ওপর খুব রাগ করেছে।

বললাম, আমি যে সারা পৃথিবীটার ওপর রাগ করে বসে আছি, সে খবর রাখিস?

আমি কোনও কথা বললেই যতীন হাসে, এইটেই তার চিরকালের স্বভাব। এমনি-সব-রহস্যের কথা কইতে কইতে যতীনকে টেনে নিয়ে এলাম একেবারে—আমার বাগবাজারের হোস্টেলে।

যতীন সবই দেখলে, সবই শুনলে। তারপর হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়ালো। বললে, চলি। আমাকে এখন অনেকদূর যেতে হবে!

জিজ্ঞাসা করলাম, আজ রাত্রেই কি তুই শ্রীরামপুর চলে যাবি?

যতীন বললে, না। কাল যাব।

—আবার কবে দেখা হবে?

যতীন হাসতে হাসতে বললে, জীবনে আর কোনোদিন দেখা হয়ত নাও হতে পারে।

এই বলে সে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে চলে গেল।

তার ব্যবহারে আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলাম না। কারণ আমি জানি—যতীন এমনিই।

সে যে আবার ফিরে আসবে তাও আমি জানি।

কিন্তু সে যে এমনি করে আসবে—সেই কথাটাই শুধু ভাবতে পারিনি।

সাতদিন কি তার চেয়ে কিছু বেশিই হবে, যতীনের দেখা না পেয়ে শ্রীরামপুর কলেজ-হোস্টেলে একখানা চিঠি লিখব কিনা মনে মনে ভাবছিলাম।

সেদিন দুপুরের ক্লাসে তখন সবেমাত্র গিয়ে বসেছি, দেখি সুমুখের বড় জানলাটার কাছে যতীন দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। কাছে যেতেই বললে, এখানে ছাত্র কোথায় ভর্তি করে?

—কে?

—একজন নতুন ছাত্র ভর্তি হবে।

—কোথায় সে?

—আছে এইখানে।

যতীনকে নিয়ে গেলাম আপিস-ঘরে। কত মাইনে, ক'বছরের কোর্স, ভর্তি হতে কত লাগবে—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করে সে ভর্তি হবার একটা ফর্ম চেয়ে নিলে। তারপর নিজেই লিখতে বসলো। লিখে, টাকা জমা দিয়ে, রসিদ নিয়ে আপিসঘর থেকে বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি হলো শুনি?

যতীন হেসে বললে, ভর্তি হলাম।

বললাম, তোর শ্রীরামপুরের কলেজ?

যতীন বললে, ছেড়ে দিলাম।

—অন্যায় করলি। এখানকার কোনও কলেজে ভর্তি হলেই পারতিস তোর বাবা হয়ত ভাববেন আমার জন্যেই তুই কলেজ ছাড়ালি।

যতীন বললে, না, কেউ কিছু ভাববে না। বাবা মারা গেছে।

শুনে কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কলকাতায় কোথায় থাকবি ?

—যেখানেই থাকি, তোদের এই হোস্টেলে থাকবো না।

বললুম, এখানে তোর ঠাঁই হবে না। তুই খৃষ্টান।

যতীন বললে, যদি না জানাই, সে-কথা জানবে কে ? আমার গায়ে তো লেখা নেই ! আমার উপাধি আজো ঘোষ।

এই বলে সে হাসতে হাসতে বললে, তোদের সবাইকার জাত আমি মেরে দিতে পারি। তা জানিস ?

বললাম সে সুযোগ তোকে দেব না। টাকা এলেই আমি এ হোস্টেল ছেড়ে চলে যাব বাদুড়বাগান রো'তে।

যতীন বললে, ভালই হবে। একসঙ্গে আসব যাব।

এই বলে আমাকে সেদিন আর ক্লাস করতে দিলে না। বললে, চল আমার থাকবার জায়গাটা তোকে দেখিয়ে দিয়ে নজরুলের কাছে যাব।

বড় রাস্তার ওপর ছোট্ট একখানি দোতলা বাড়ি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কার বাড়ি রে ? কে থাকে এখানে ?

—আমার একজন আপনার লোক। বলেই যতীন আমাকে টানতে টানতে দোতলায় নিয়ে গেল। বললে, চা খাবার সময় হয়েছে।

সোফা-সেট্ দিয়ে সাজানো চমৎকার একটি ঢাকা বারান্দা। সেইখানেই বসতে যাচ্ছিলাম। যতীন আমাকে বসতে দিলে না। টেনে নিয়ে এলো একেবারে একটা ঘরের ভেতর।

একটা ইজিচেয়ারের ওপর পেছন ফিরে বসে কে একটি মেয়ে যেন কি-একটা বই পড়ছিল। যতীন বললে, ছাখো কাকে ধরে এনেছি।

চট্‌'করে মেয়েটি উঠে বসলো। মুখ ফেরাতেই দেখি—যতীনের দিদি।

ভাবতেও পারিনি—এতদিন পরে, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দিদির দেখা পাব।

হাসতে হাসতে দিদি উঠে এলো। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই অপরূপসুন্দর লীলায়িত সুঠাম ভঙ্গী !

দিদি আমার হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে খাটের উপর।

নিজেও বসলো আমার পাশে। আমার একখানা হাত চেপে ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো। তাকিয়েই রইলো।

মুখ তুলে আমি চাইতে পর্যন্ত পারছি না।

দিদি বললে, তোর এমন সুন্দর চুলগুলো গেল কোথায়?

বললাম, ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল যে!

—শুনেছি যতীনের কাছে। কই দেখি। বলেই দিদি আমার চোখের নীচেটা টেনে দেখলে।

যতীন তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

দিদি বললে, তুই যুদ্ধে চলে গেছিস শুনে কি কান্নাই না কেঁদেছিলুম! —তারপর যতীন একদিন বললে তুই ফিরে এসেছিস।

বললাম, তুমি তখন কোথায়? প্রসাদপুরে?

—সেখানকার পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি।

দিদি নামলো খাট থেকে। বললে, মেয়েটা বাঁচলো, না মরলো একটা খবরও নিলি না তো!

কি বলব? চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

দেয়ালে-টাঙানো বড় আরশিটার সুমুখে দাঁড়িয়ে দিদি তার মাথার চুলটা ঠিক করে নিয়ে বললে, তোরা সত্যিই ভারি নিষ্ঠুর!

প্রসঙ্গটা সেদিন চাপা দিতে চেয়েছিলাম।

বলেছিলাম, যতীনকে কলেজ ছেড়ে শর্টহ্যাণ্ড শিখতে কে উপদেশ দিলে?

—কলেজে পড়ে বলেছে বুঝি?

দিদি একটু হেসে বলেছিল, তোর সঙ্গে রসিকতা করেছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে থেকে খালি টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। বাবা মারা যাবার পর ওর ধারণা হয়েছে ওর পড়ার খরচ আমি বুঝি চালাতে পারব না।

বলেছিলাম, সত্যিই তো, তুমি ওর খরচ কেমন করে চালাবে?

দিদি একটু ম্লান হেসে কি যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

যতীন এসে ঘরে ঢুকেছিল চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। চাকরের হাতে

ছিল ট্রের ওপর চায়ের সরঞ্জাম, টোস্ট, মাখন, আর ছবি ঝলমল বিলিতী বিস্কুটের টিন।

সেই সব খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম নজরুলের কাছে যাব বলে। রাস্তায় যতীন বলেছিল—দিদি ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেছে, এবার প্র্যাক্টিস করবে।

সেদিন তার কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করিনি। করতে পারিনি।

তারপর একদিন নিজের চোখেই দেখেছি লেডি-ডাক্তার অরুণা ঘোষের প্রসার প্রতিপত্তি। দেখেছি তার দেহ মনের অতুল ঐশ্বর্য, দেখেছি তার সেবাব্রতে নিষ্ঠা। দেখেছি পরমাসুন্দরী এই রহস্যময়ী নারীর একটুখানি হাসির দাক্ষিণ্য, তার হাতের স্পর্শের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবার মত, কৃতার্থ হয়ে অবলুণ্ঠিত হবার মত সহস্র পুরুষের হীনমন্য ব্যাকুলতা। আর সেইসঙ্গে দেখেছি জীবন-সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী ক্ষীণতনু-সেই উদ্দাম-যৌবনের আত্মনির্যাতনের অত্যাশ্চর্য মহিমা।

অতৃপ্ত ছিল লেডি-ডাক্তার অরুণা ঘোষের অন্তরাত্মা। পৃথিবী তাকে সবই দিয়েছিল, দেয়নি শুধু সেই অমৃতের প্রসাদ—যা পেলে ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একটি মেয়ের জীবন পরম শান্তিতে ভরপুর হ'য়ে উঠত!

সে সংবাদ পেয়েছিল মাত্র দু'জন আগন্তুক। একজন বিপত্নীক ডাক্তার রুদ্র। পার্থিব ঐশ্বর্য ছিল তার প্রচুর। আর-এক জন নিঃস্ব নিঃসম্বল প্রিয়দর্শন ক্রিশ্চান যুবক, অবনী সান্যাল। ডাক্তারী ডিপ্লোমা ছিল তার। বিলেতের ডিপ্লোমা। কিন্তু প্র্যাক্টিস করতো না। বেকার হ'য়ে হয়ত অরুণা ঘোষের সযত্ন-লালিত সেই হৃদয়-তৃষ্ণাকে অভিনন্দিত করবার জন্য দু'জনে হাত বাড়িয়েছিল একই সঙ্গে। ঋতু-চক্রের আবর্তনে মাত্র দুট ঋতু পার হ'য়েছিল তাদের জীবনে। কতটুকুই-বা সময়। তবু এই অল্প সময়—যে-ইতিকথা রচনা করেছিল অরুণা ঘোষের মন-মানসে, সে এক অনন্যসাধারণ প্রেমের কাহিনী।

সুযোগ পেলে শোনাব সে-কথা।